রবীন্দ্রনাথ

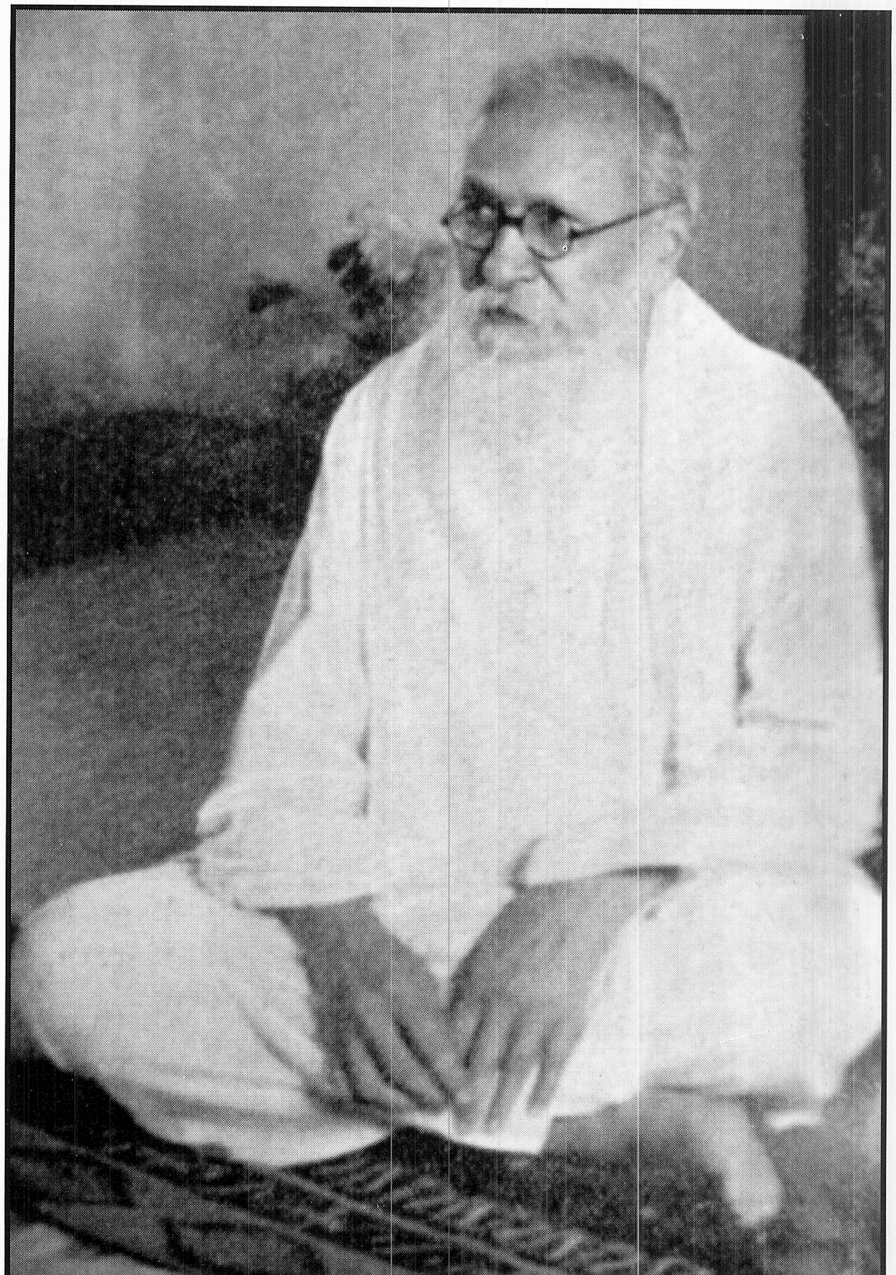
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনা

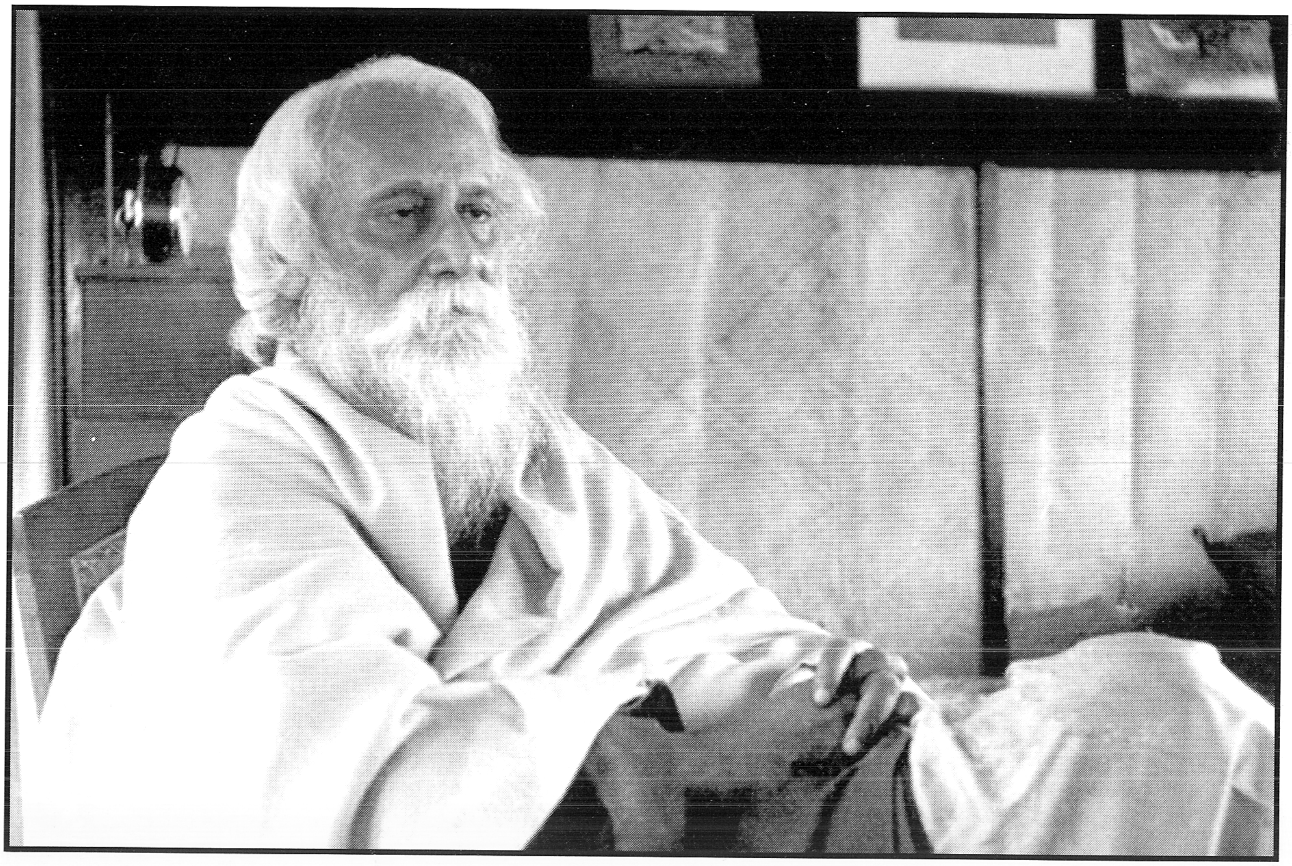
অর্ণব নাগ

রবীন্দ্রনাথ

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়



রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়



রবীন্দ্রনাথ (পরিমল গোস্বামীর তোলা ছবি)

রবীন্দ্রনাথ

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

স ম্পা দ না
অর্ণব নাগ

সূত্রধর

RABINDRANATH
Ramananda Chattopadhyay
Edited by Arnab Nag
Published by Sutradhar
47/B Bose Para Lane, Ground Floor, Baghbazar
Kolkata 700 003

₹ 150.00

প্রকাশ : ১৫ জানুয়ারি ২০১৫। ৩০ পৌষ ১৪২১

প্রচ্ছদ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদ-রূপায়ণ : কুমারজিৎ সানি

সকৃতজ্ঞ :
তপোব্রত ঘোষ, হৈমন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়,
বিজয় মাল, নিমাই দে

বিনিময় : ১৫০.০০ টাকা

সূত্রধর-এর পক্ষে সুমন ভৌমিক, ৪৭/বি, বোসপাড়া লেন, একতলা, বাগবাজার, কলকাতা ৭০০ ০০৩ কর্তৃক প্রকাশিত ও ফটিক জল প্রকাশনী, বাগবাজার, কলকাতা ৭০০ ০০৩ থেকে বর্ণসংস্থাপিত ও মুদ্রিত।
যোগাযোগ : ৯৯০৩৯ ৮০৫৪৪

সূত্রপাত

১

রবীন্দ্র-রামানন্দের সম্পর্কের কালসীমা সাড়ে চার দশকেরও বেশি সময়ের। কন্যা শান্তা দেবী-কে লেখা চিঠিতে রামানন্দ মনে করতে পারেননি রবীন্দ্রনাথকে তিনি কোথায় প্রথম দেখেছেন কিংবা কবে থেকে তাঁদের বন্ধুত্বের সূত্রপাত। বলাই বাহুল্য, রামানন্দ-দুহিতারাও এই হদিশ দিতে পারেননি। তবে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দিয়েছেন। প্রথমত, সীতা দেবী লিখেছেন : 'বাবার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কখন আলাপ হয় তা ঠিক আমি জানি না। দু'জনেই সাহিত্যব্রতী, দু'জনেই মাসিকপত্রের সম্পাদক ছিলেন, এই সূত্রে তাঁদের পরিচয় হয়ে থাকবে।' (*পিতৃস্মৃতি, প্রবাসী ষষ্টি বার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ*, ১৩৬৭)। দ্বিতীয়ত, শান্তা দেবীর অনুমান রামানন্দ-সম্পাদনার ইতিহাসে আদি যুগের পত্রিকা *দাসী*-র গ্রাহক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কারণ 'বরিন্দ্র'নাথ ঠাকুরের নামে মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার ছাপার ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। (*রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা*, দে'জ, ২০০৫)। এই *দাসী* পত্রিকারই ১৮৯৬ সালের মার্চ সংখ্যায় রামানন্দ রবীন্দ্রনাথের *নদী* কবিতার সমালোচনা করেন (এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে যা মুদ্রিত)। অপ্রত্যক্ষ হলেও উভয়ের সম্পর্কের সেই শুরু। পরবর্তী সময়ে রামানন্দ-সম্পাদিত *প্রদীপ* পত্রিকার (পৌষ, ১৩০৪—মাঘ, ১৩০৬) নিয়মিত লেখক হয়ে ওঠেন রবীন্দ্রনাথ। এই পর্বেই এলাহাবাদ নিবাসী রামানন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ আলাপ। ভাইপো বলেন্দ্রনাথের (বীরেন্দ্রনাথ-প্রফুল্লময়ীর পুত্র) অকাল প্রয়াণের পর তাঁর বিধবা স্ত্রী সুশীলতা বা সাহানা-কে আনবার জন্য দেবেন্দ্রনাথের আদেশে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদে গিয়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়টি সেরে আসেন রবীন্দ্রনাথ। রামানন্দ-কন্যা বালিকা সীতার স্মৃতিচারণায় (*পুণ্যস্মৃতি*) যার বিবরণ রয়েছে। কখনও-সখনও প্রবল দুর্যোগ সত্ত্বেও পরবর্তী চার

২

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে রামানন্দ প্রধানত তাঁর জীবনের শেষ পর্বে এই প্রবন্ধগুলি লিখেছেন। এর মধ্যে মূলত তিনটি প্রবন্ধে তিনি কবির সার্বিক মূল্যায়নে সচেষ্ট হয়েছেন। যার মধ্যে আবার দুটি রবীন্দ্রনাথের সত্তর বর্ষ ও সাতাত্তর বর্ষের জন্মদিন উপলক্ষে বিরচিত। এই প্রবন্ধদ্বয় হল যথাক্রমে : *রবীন্দ্রনাথ* (*জয়ন্তী-উৎসর্গ* গ্রন্থে সংকলিত, গ্রন্থটি ১১ পৌষ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়) এবং *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর* (*প্রবাসী*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫ ব.)।

কবি-প্রয়াণের পর *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর* শিরোনামে আরেকটি প্রবন্ধ (*প্রবাসী*, ভাদ্র, ১৩৪৮ ব.) লেখেন তিনি, যার মধ্যেও কবি-প্রতিভার মূল্যায়ন রয়েছে। শুধু বাংলাভাষায় এনিয়ে লেখনী ধারণ করে রবীন্দ্র-প্রতিভাকে কেবল বাঙালি পাঠকের মধ্যেই আবদ্ধ রেখে সন্তুষ্ট হতে পারেননি রামানন্দ। তাই তৎ-সম্পাদিত ইংরেজি *মডার্ন রিভিউ*-তেও অনুরূপ প্রবন্ধ প্রকাশে আগ্রহী হয়েছিলেন তিনি। যেমন কবির সত্তর বর্ষের জন্মদিন উপলক্ষে তিনি লেখেন *Rabindranath Tagore* (*Modern Review*, December, 1931, p. 675-681)। এই উপলক্ষে রামানন্দ *The Golden Book of Tagore* নামে ইংরেজি ভাষায় সুবৃহৎ এবং রবীন্দ্র-জীবন ও কর্মের আলোকপাতে যে অমূল্য আকর গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন, তার Foreward অংশটিতে *Rabindranath Tagore* প্রবন্ধের কথাগুলিই বলা রয়েছে। এই শিরোনামে রামানন্দ আরও দুটি ইংরেজি প্রবন্ধ লেখেন; একটি কবির সাতাত্তর বছরের জন্মদিনে (*মডার্ন রিভিউ*, জুন, ১৯৩৮, পৃ. ৬১৩-৬২২), অন্যটি কবি-প্রয়াণের পর (*মডার্ন রিভিউ*, সেপ্টেম্বর, ১৯৪১, পৃ. ২৬১-২৭৪)। ওই একই শিরোনামে তিনি ইংরেজি *বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি* পত্রিকা-র (ভল্যুম ৭, ১ ও ২ খণ্ড, মে-অক্টোবর, ১৯৪১, পৃ. ১-৩০, সম্পা. কৃষ্ণ কৃপালিনী) রবীন্দ্র-জয়ন্তী সংখ্যায় একটি বড়ো প্রবন্ধ লেখেন। উপাদানের তারতম্য না থাকলেও বাংলা অনভিজ্ঞ পাঠকের কাছে তাঁর রবীন্দ্র-প্রচারের আতিশয্য লক্ষণীয়।

এছাড়া রবীন্দ্র-প্রয়াণের পর তিনি আরও গোটা তিনেক প্রবন্ধ লেখেন। এর মধ্যে দুটি হল, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন জনকে লেখা চিঠিপত্র ৬/৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের বিশ্বভারতী থেকে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হতে শুরু করায় এর প্রথম খণ্ড (কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী-কে লেখা) ও দ্বিতীয় খণ্ড

কবির মাসিকপত্রে মুদ্রিত প্রথম রচনা 'জ্ঞান-প্রকাশ' নামক মাসিকে বের হয়। পাঠকের অবগতির জন্য জানাই, রবীন্দ্রনাথ তাঁর *জীবন-স্মৃতিতে* নিজের প্রথম গদ্য-রচনা প্রকাশের জন্য যে সাময়িকীটিকে চিহ্নিত করেছেন, তার নাম 'জ্ঞান-প্রকাশ' নয়, *জ্ঞানাঙ্কুর* (দ্রষ্টব্য : *জীবনস্মৃতি, প্রবাসী*, ফাল্গুন, ১৩১৮)। প্রকৃতপক্ষে *জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব*। রামানন্দ মূলত তাঁর স্মৃতি থেকে (প্রবাসী-তে প্রকাশিত *জীবন-স্মৃতির* মূল পাণ্ডুলিপি তিনি অবশ্যই দেখেছিলেন) এই প্রবন্ধটি লেখায় বোধহয় এ ধরনের ভ্রান্তি ঘটেছে। পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথের সত্তরতম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে লেখা *রবীন্দ্রনাথ* শীর্ষক প্রবন্ধে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি দেখি। যদিও আধুনিক গবেষকদের তথ্যে দেখা যাচ্ছে ১২৮২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যার *জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব*-এ প্রথম রবীন্দ্র-রচনা প্রকাশের আগেই *তত্ত্ববোধিনী, বান্ধব, অমৃতবাজার পত্রিকা, প্রতিবিম্ব* প্রভৃতি সাময়িকীতে তাঁর রচনা বেরিয়েছে। ১২৮০ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের *বঙ্গদর্শনে* প্রকাশিত *ভারতভূমি* কবিতাটি রবীন্দ্র-রচিত হলে সেটিকেই তাঁর সাময়িকপত্রে প্রকাশিত প্রথম রচনা বলা চলে। (বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : *সাধনা পত্রিকা ও রবীন্দ্রনাথ*, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৬৪-৭৬)। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে পাঁচটি সাময়িকীর সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেছেন। সেগুলি হল (বন্ধনীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক থাকার সময়সীমা সংখ্যানুযায়ী নির্দিষ্ট হয়েছে) :

(১) *সাধনা* (অগ্রহায়ণ, ১২৯৮ - কার্তিক, ১৩০২)
(২) *ভারতী* (বৈশাখ, ১৩০৫ - ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩০৫)
(৩) নবপর্যায় *বঙ্গদর্শন* (বৈশাখ, ১৩০৮ - চৈত্র, ১৩১২)
(৪) *ভাণ্ডার* (বৈশাখ, ১৩১২ - জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩১৪)
(৫) *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* (বৈশাখ, ১৩১৮ - চৈত্র, ১৩২১)

[এই তালিকা পূর্বোক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্ট থেকে প্রাপ্ত]

এছাড়াও তিনি জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত *বালক* পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষও ছিলেন।

রবীন্দ্র-রামানন্দ যোগসূত্র কিন্তু অবশ্যই সাময়িক পত্রিকা। সেইদিক দিয়ে তাঁদের মধ্যে লেখক-সম্পাদকের সম্পর্কও যে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো বয়ে চলেছিল তা এঁদের পরমাত্মীয়তার বন্ধনকে মাথায় রেখেও মেনে নিতে

দশকের বেশি সময় যে পরিচয় কেবল লেখক-সম্পাদকের সংকীর্ণ গণ্ডিতে আটকে থাকেনি, বরং রক্তের আত্মীয়তার ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করে তা আত্মার আত্মীয়তার মর্যাদা লাভ করেছিল।

এবার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কৈফিয়ত সেরে নেবার পালা। প্রথমত, রবীন্দ্র-রামানন্দ সম্পর্কের মহাভারত রচনা করতে আমরা বসিনি। তবে কি না এক বালতি গঙ্গাজলে স্নান করলে, গঙ্গার গভীরতা অনুধাবন না করতে পারলেও এক ধরনের পুণ্যলোভাতুর মন যেমন অনির্বচনীয় শান্তি পায়, তেমনি রামানন্দের রচনায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সুবিদিত সম্পর্কের ব্যাপ্তি অনুসন্ধানের ধৃষ্টতা না দেখালেও, তার আভাস পাওয়ার চেষ্টা করা অযৌক্তিক নয়।

এবার দ্বিতীয় কৈফিয়ত। রবীন্দ্রনাথের ওপর রামানন্দের লেখা বাংলা প্রবন্ধগুলিই এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। কিন্তু এর বাইরেও রামানন্দের রবীন্দ্র-রচনার আরও বড়ো একটি অংশ রয়ে গিয়েছে সুবিখ্যাত *প্রবাসী*-র ততোধিক বিখ্যাত 'বিবিধ-প্রসঙ্গ'-এ। ১৯৭৬-এর সেপ্টেম্বরে কলকাতার টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত সোমেন্দ্রনাথ বসুর *সাময়িক পত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ : প্রবাসী* (১৩০৮-১৩৪৮ আষাঢ়) গ্রন্থে 'বিবিধ-প্রসঙ্গ'-এ প্রকাশিত রবীন্দ্র-সংবাদগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে। যা মূলত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়েরই লেখনী। রবীন্দ্র-রামানন্দ সম্পর্কের মূল্যায়নে সেগুলি যে পুনর্মুদ্রণের দাবি রাখে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সব একসঙ্গে ছাপতে গেলে তার কলেবর কী দাঁড়াবে ভেবে আমরা কূল-কিনারা পাইনি। তাই পাঠক-পাঠিকাদের জন্য বিধিসম্মত সতর্কীকরণ—এই সংকলনভুক্ত প্রবন্ধগুলি আসলে রামানন্দ-রবীন্দ্র সম্পর্কের হিমশৈলের চূড়ামাত্র। তবে কিনা জলের তলায় থাকা হিমশৈলের সিংহভাগ দেখা না দেওয়ায়, তার চূড়াই যেমন তার পরিচায়ক তেমনি রবীন্দ্র-রামানন্দ সম্পর্কেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এহেন সম্পর্কের প্রত্যক্ষদর্শী ক্ষিতিমোহন সেনের একটি স্মৃতিচারণা আমরা উদ্ধার করেছি মূলত এই আশা ও ভরসায় যে চন্দ্রালোকের উৎস সূর্যের আলো হলেও রৌদ্রের খরদীপ্তির চেয়ে জ্যোৎস্না যখন অনেক মনোরম হয় তখন রবীন্দ্র-রামানন্দ বিষয়ে শোনা কথার চাইতে দেখা কথাও নিশ্চয়ই বেশি মনোগ্রাহী হবে।

পাঠকের কাছে কোনো কৈফিয়তের দরকার হত না। পাঠকদের ক্ষমাগুণের পরে নির্ভর করে এমনতর আটপৌরে ঢিলেমি করবার সুযোগ প্রবাসী-সম্পাদক স্বীকার করেননি—নিজের মানরক্ষার খাতিরেই সময়রক্ষার স্খলন হতে দিলেন না। তিনি প্রমাণ করলেন বাংলা সাময়িক পত্রে এই প্রচুর ভোজ এবং নূতন ভদ্র চাল অচল হবে না। বস্তুত পাঠকদের এমন অভ্যাস জন্মে গেল যে আয়োজনে কম পড়লে বা আচরণে শৈথিল্য ঘটলে আর নিজগুণে তারা ত্রুটি মার্জনা করবে না যে, এতে সন্দেহ রইল না। প্রবাসী-জাতীয় পত্রিকা দেশের একটা প্রয়োজন সিদ্ধি করেচে। জনসাধারণের চিত্তকে সাহিত্যের নানা উপকরণ দিয়ে তৃপ্ত করা এর ব্রত। এতে মনকে একেবারে জড়তায় জড়াতে দেয় না, নানা দিক থেকে মৃদু আঘাতে জাগিয়ে রাখে।' (*পরিচয়*, কার্তিক, ১৩৩৮)

এই প্রসঙ্গে *প্রবাসীর* দুই পাঠক (পরবর্তীকালে বিশ্ববিশ্রুত লিখিয়ে)-এর মন্তব্য উদ্ধৃত করতে চাই। প্রথমজন প্রমথনাথ বিশী, যিনি লিখেছিলেন : 'রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রবাসীর প্রধান লেখক, যতকাল জীবিত ছিলেন তিনিই ছিলেন প্রধান লেখক।' (*সেকালের প্রবাসী, প্রবাসী ষষ্টি-বার্ষিকী স্মারক-গ্রন্থ*, ১৩৬৭)। অপরজন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। যাঁর বক্তব্য : 'প্রবাসী পত্রিকায় বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ লেখকেরা লিখিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আমরা যখন কলেজে পড়ি তখন হইতে আরম্ভ করিয়া কবিগুরুর তিরোধানের সময় পর্য্যন্ত (কিছুকাল ধরিয়া সবুজপত্রের সঙ্গে সঙ্গে) প্রবাসী বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া রবীন্দ্রনাথের রচনার মুখ্য প্রকাশভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এইভাবে বাঙ্গালীর মধ্যে সহজেই নিয়মিতভাবে রবীন্দ্রনাথের অমর রচনা পরিবেশন করিয়া দিবার কৃতিত্ব প্রবাসীরই।' (*ষষ্টি-পূর্তি*, পূর্বোক্ত গ্রন্থ)

প্রবাসী-তে লিখেই প্রথম দক্ষিণাপ্রাপ্তি ঘটে রবীন্দ্রনাথের। কবি-জীবনের বৃহত্তম উপন্যাস *গোরা* লেখার জন্য রবীন্দ্রনাথের অগ্রিম প্রাপ্তিযোগ ঘটে তিনশো টাকা। মৈত্রেয়ী দেবী এ প্রসঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে বলেছেন—'একখানি উপন্যাস সময়মত প্রবাসী-র জন্য লিখবেন এই অনুরোধ জানিয়ে অগ্রিম মূল্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন (রবীন্দ্রনাথকে)—তাতেই যে এই বৃহৎ অপূর্ব রচনার জন্ম এজন্য সম্পাদকের মনে আনন্দমিশ্রিত গর্ব ছিল।'

(কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা) নিয়ে রামানন্দের আলোচনা। অন্যটি, ত্রিপুরার রাজবংশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নিয়ে তিনি কলম ধরেন। তবে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তাঁর আদিতম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে *রবীন্দ্রনাথ ও মাসিকপত্র* শিরোনামে। এর মধ্যে শেষোক্ত প্রবন্ধটি বাদ দিলে বাকিগুলি রীতিমতো তথ্যনির্ভর, বিশ্লেষণধর্মী প্রামাণ্য রচনা। কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা এলেও তা বৃথা যায়নি, বরং পরবর্তীকালের গবেষকদের কাছে তা মৌলিক সূত্রে পরিণত হয়েছে। সেই তুলনায় *রবীন্দ্রনাথ ও মাসিকপত্র* রচনাটি অনেকাংশে স্মৃতিনির্ভর। কিন্তু এ নিয়ে কথা বলার একমেবাদ্বিতীয়ম্ হকদার যে 'সম্পাদকদের সম্পাদক' রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তা বলা বাতুলতা মাত্র। সুতরাং এই রচনাটিও কালোত্তীর্ণ হয়েছে। এই সংকলনে প্রত্যেকটি রচনাই কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের *নদী* কবিতাটির রামানন্দ-কৃত সমালোচনাটি কালের বিচারে সর্বাগ্রে প্রকাশিত হলেও আমাদেব সংকলনে তাকে ঠাঁই দিতে হল সংযোজন অংশে। কারণ আর কিছুই নয়, যেহেতু এই রচনায় রবীন্দ্র-মানসের বিশ্লেষণ নেই। কিন্তু শিশু উপযোগী রচনাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্র-মনোতটে রামানন্দের নিজেকে প্রতিস্থাপনের এহেন দৃষ্টান্ত আর নেই। পাঠক স্মরণে রাখবেন, এটি লেখার সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়নি রামানন্দের। তাই রবীন্দ্র মনোভূমি বিচারের প্রয়োজনীয় রসদ তাঁর কাছে না থাকাই স্বাভাবিক। বোধহয় একটি কবিতা—*নদী*-ই সেই অভাব ঘুচিয়ে দিতে পেরেছিল। তাই মূল সংকলনের আওতায় একে অন্তর্ভুক্ত না করা গেলেও সংযোজন অংশ-ভুক্ত করতে কোনো অসুবিধে হয়নি।

৩

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মাসিকপত্রের সম্পর্ক নিয়ে রামানন্দ শুধুমাত্র একটি প্রবন্ধ লিখেই নিশ্চুপ থাকেননি। রবীন্দ্র-প্রতিভা বিশ্লেষণে যখনই সুযোগ পেয়েছেন সাময়িকপত্রের সঙ্গে তাঁর ওতপ্রোত সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। একথা অনস্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত লেখাই প্রথমে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। যদিও প্রাথমিক পর্বে (১৮৭৪-১৮৮১) সাময়িকপত্রে প্রকাশিত তাঁর অধিকাংশ রচনাই ছিল স্বাক্ষরবিহীন। রামানন্দ লিখেছেন যে,

অগাস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত সি.এফ.অ্যান্ড্রুজের *অ্যান ইভনিং উইথ রবীন্দ্র* প্রবন্ধটির কথা যা নোবেল-প্রাপ্তির প্রাক্কালে কবি-পরিচয়কে বহির্বিশ্বে উন্মুক্ত করে দেয়।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের *প্রদীপের* সম্পাদনাভার ত্যাগের পেছনে, পরোক্ষে হলেও রবীন্দ্রনাথের একটা ভূমিকা ছিল। রামানন্দ ছিলেন সেই দুর্লভ প্রজাতির মানুষ যাঁরা একান্ত প্রিয়জনের চাইতে নীতিনিষ্ঠতাকেই অনেক বেশি মর্যাদা দেন। রবীন্দ্রনাথের কঠোরতম সমালোচক বিদ্যাসাগর-দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর সম্পাদিত *সাহিত্য* পত্রিকায় কবিগুরুর নিন্দাসূচক কোনো লেখা ছাপান। এক রবীন্দ্র-অনুরাগী তার তীব্র বিরোধিতা করে সাহিত্যের ওই লেখককে তুলোধোনা করার জন্য *প্রদীপে* একটি ব্যক্তিগত-বিদ্বেষমূলক কবিতা পাঠান। আদর্শবাদী সম্পাদক একান্ত রবীন্দ্র অনুগামী হলেও এ ধরনের কাদা ছোড়াছুড়িকে প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই *প্রদীপ* পরিচালক বৈকুণ্ঠনাথ দাস কবিতাটি *প্রদীপে* ছাপিয়ে দিলেও এলাহাবাদে তার ফাইল-কপি প্রাপ্তিমাত্র কবিতাটি না ছাপতে নির্দেশ দেন রামানন্দ। এদিকে সব কাগজ তখন ছাপা হয়ে গিয়েছে। অগত্যা *প্রদীপ*-সম্পাদকের সম্মান রাখতে রবীন্দ্র-অনুরাগীর ওই কবিতাটির ওপর একটি কাগজে আরেকটি কবিতা ছাপিয়ে তা আটকে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আদর্শের যে পরাকাষ্ঠা রবীন্দ্র-অনুরাগী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক্ষেত্রে দেখালেন, ঘোরতর রবীন্দ্র-বিদ্বেষী সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মধ্যে তার ছিটেফোঁটাও দেখা গেল না। তিনি ওই কাগজটি তুলে চাপা দেওয়া কবিতাটি *সাহিত্যে* ছেপে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দকে অসম্মানিত করার লজ্জাজনক কৌশল নিলেন। ফলত রামানন্দবাবু উপলব্ধি করলেন সুদূর এলাহাবাদ থেকে কলকাতার মাসিক-পত্র সম্পাদন দুরূহ কর্তব্য। (দ্রষ্টব্য : *প্রবাসী*, পৌষ ১৩৫০, পৃ. ২৮০) সুতরাং নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের হাতে *প্রদীপের* সম্পাদনাভার সঁপে দিলেন তিনি। যদিও তার পরেও লেখক হিসেবে পত্রিকাটির সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল।

সম্পাদক রামানন্দ-কে পড়ে ফেলতে তাই রবীন্দ্রনাথের সেই অমোঘ উক্তি অবশ্য প্রণিধানযোগ্য : 'বারবার দেখেছি প্রবাসী সম্পাদক সাধারণের অথবা কোনো কোনো ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়ের অপ্রিয়তা করে নিজের ক্ষতির কারণই ঘটাইয়াছেন। সকল সময়ে তাঁর উত্তেজনা আমার ভালো লাগেনি।

হচ্ছে। *প্রদীপ* পত্রিকা দিয়ে এঁদের লেখক-সম্পাদক সম্পর্কের গোড়াপত্তন। যা পূর্ণতা পায় *প্রবাসী*-তে। সোমেন্দ্রনাথ বসুর *সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ : প্রবাসী* (১৩০৮-১৩৪৮ আষাঢ়) গ্রন্থটির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। বইটির শেষে চিত্রা দেব কৃত '(*প্রবাসী* ১৩৫০ পর্যন্ত)' *রবীন্দ্র আলোচনার সূচী*' যুক্ত করায় *প্রবাসী* পত্রিকায় রবীন্দ্র-চর্চার ধারাটি বুঝতে সুবিধে হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ড. মঞ্জুশ্রী দাস সামন্ত লিখেছেন *প্রবাসী ও রবীন্দ্রনাথ* (দে বুক স্টোর, ১৯৯৭(?))। কিংবা হালফিলে শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও সুদীপ বসুর সম্পাদনায় *রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-এর প্রবাসী ইতিহাসের ধারা* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে 'রবীন্দ্রনাথ : সাহিত্য, জীবন, কর্ম ও বিতর্ক' শিরোনামের অধ্যায়ে *প্রবাসী*-তে প্রকাশিত রবীন্দ্র-সংবাদ তুলে ধরে রবীন্দ্র মনন ও সৃজন চর্চায় *প্রবাসী* পত্রিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করার আরও একটা সুযোগ আমাদের সামনে হাজির করেছে। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-য়* (১১৬ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, ১৪১৬; প্রকাশকাল : শ্রাবণ, ১৪১৮, পৃ. ১৫৫-১৬৪)। প্রবীরকুমার বৈদ্য *প্রদীপের* সংখ্যানুক্রমিক রচনাপঞ্জি সাজিয়ে দেওয়ায় উৎসাহী পাঠকেরা রামানন্দের সম্পাদনাকালে (পৌষ, ১৩০৪—মাঘ, ১৩০৬) এই পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার খতিয়ানে চোখ বুলিয়ে নিতে পারবেন। সুতরাং *প্রদীপ* ও *প্রবাসী*-তে যে রাবীন্দ্রিক মহাভারত রচিত হয়েছিল তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ খুব একটা দুর্লভ নয়।

আমরা এখানে সেই চর্বিত-চর্বণে না গিয়ে এই পত্রিকাদুটির ব্যাপারে রবীন্দ্র-মনোভাব পাঠকের সামনে উদ্ধার করতে চাই। *পরিচয়* পত্রিকা-র সূচনা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ এই ত্রৈমাসিকটির সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-কে যে পত্র দেন তা এর দ্বিতীয় সংখ্যায় উদ্ধৃত হয়। যাতে কবিগুরু লেখেন : 'প্রথম যখন রামানন্দবাবু প্রদীপ ও পরে প্রবাসী বের করলেন তাঁর কৃতিত্ব ও সাহস দেখে মনে বিস্ময় লাগল। আকারে বড়ো, ছবিতে অলংকৃত, রচনায় বিচিত্র, এমন দামী জিনিস যে বাংলদেশে চলতে পারে তা বিশ্বাস হয়নি। তাছাড়া এর আগে বাংলা সাময়িক পত্রে সময় রক্ষা করে চলার বাঁধাবাঁধি ছিল না। সেকালে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ যেমন অপরাহ্ণ বা সায়াহ্নে যাত্রা শুরু করতে লজ্জিত হত না, মাসিকপত্র তেমনি ললাটে মলাটে বৈশাখ মাসের তিলক কেটে অগ্রহায়ণ মাসে যখন অসংকোচে আসরে নামত সহিষ্ণু

কাছে রবীন্দ্রনাথ যে কতটা স্বস্তিকর তা ওই ভূমিকায় তুলে ধরেন তিনি। পাশাপাশি রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন, যে হস্তাক্ষরের ব্র্যান্ড ভ্যালু সে যুগে তো ছিলই, বর্তমান যুগে তা আরও বেশি দামি। লেখকের হস্তাক্ষর সম্পাদকদের যে কতভাবে বিপদে ফেলে এ-ধরনের লেখালিখি ছাপাছাপি-র সঙ্গে যাঁরা যুক্ত আছেন তাঁদের অজানা নয়। রবীন্দ্রনাথ সেদিক দিয়েও রেহাই দিয়েছিলেন রামানন্দকে। রামানন্দের নির্ভেজাল স্বীকারোক্তি : 'I have been privileged to publish perhaps a larger number of poems, stories, novels, articles, etc., from Rabindranath's pen, in Bengali and English, than any other editor. It has been a privilege without any penalty attached to it, as he is regular, punctual and methodical, and as it is easy and pleasant to read his beautiful hand-writing. As an editor, he was the making of many authors, who subsequently became well-known, by the thorough revision to which he subjected their work. His beautiful hand-writing has been copied by so many persons in Bengali that even I who have had occasion to see it so often cannot always distinguish the genuine thing from the imitation. (Foreword, *The Golden Book of Tagore*, p. x)। রামানন্দ অন্যত্রও রবীন্দ্রনাথের কর্তব্য-নিষ্ঠার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-সম্পন্ন মন্তব্য করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সত্তর ও সাতাত্তরতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলা, ইংরেজি দু'ভাষাতেই লেখা প্রবন্ধে রামানন্দ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্র-মানসের কিছু জরুরি প্রেক্ষাপট ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের *প্রবাসী*-তে 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-এ প্রকাশিত রামানন্দের রবীন্দ্র-সাধনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ—'তাঁহার প্রতিভা কোন্ বিষয়ে কত উচ্চ শ্রেণীর, তাহা নিরূপণ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে, মানবচরিত্রের জ্ঞানে ও বিশ্লেষণে, সাহিত্যের নানা বিভাগে সৃষ্টির কার্যে, গান রচনায়, সুরের সৃষ্টিতে ও কণ্ঠ-সংগীতে, চিত্রাঙ্কনে ও স্থাপত্যে, অভিনয়ে ও নৃত্যকলায়, রাজনীতির সার অংশের জ্ঞানে, শিক্ষার মূলনীতি সম্বন্ধীয় জ্ঞানে ও তাহার প্রয়োগে, ইতিহাসের

(*কবি সার্বভৌম*, মৈত্রেয়ী দেবী, ১৩৫৮ ব.)। রবীন্দ্রনাথকে 'পেশাদারি লেখক' করে তুলতে তাই *প্রবাসী*র ভূমিকা অবিসংবাদিত। রবীন্দ্রনাথও পেশাদারি সৌজন্য দেখিয়ে তাঁর কোনো লেখার সঙ্গে সম্পাদককে পাঠানো চিঠিতে 'মনোনীত হলে ছাপাবেন' কথাগুলি লিখে দিতেন। (পূর্বোক্ত গ্রন্থ)। পরবর্তীকালে এই দক্ষিণা-প্রাপ্তিকে কেন্দ্র করেই রবীন্দ্র-রামানন্দ সম্পর্কে দুর্যোগের কালো মেঘ দেখা দিলেও সেই মেঘ কেটে গিয়ে রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনের মুখ দেখতে বঙ্গবাসীর বেশি দেরি হয়নি।

রামানন্দ সম্পাদিত *মডার্ন রিভিউ* রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনা প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম ছিল। প্রথম দিকে ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পান্নালাল বসু, পাটনা কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক যদুনাথ সরকার প্রমুখের অনূদিত রবীন্দ্র-রচনা প্রকাশিত হত এই ভারতবিদিত ইংরেজি মাসিকে। কিন্তু ইংরেজিকে গুরুদেব নয়নজলে বিদায় করলেও রামানন্দের ছলেই আবার তাকে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছেন। এ-নিয়ে রামানন্দের প্রচ্ছন্ন একটি গর্ববোধও ছিল। যার প্রকাশ এই সংকলনভুক্ত রচনায় রয়েছে। রামানন্দ নিজেই জানিয়েছেন, ১৯১১ সালের শেষে কিংবা ১৯১২ সালের গোড়ায় তিনি কবিকে তাঁর রচনার ইংরেজি অনুবাদ তাঁকেই করতে বলেন। গোড়ায় গররাজি থাকলেও পরে রাজি হয়ে যান কবি। যার ফলে ১৯১২ সাল থেকে রবীন্দ্র-কবিতার প্রথম স্বকৃত অনুবাদ আমরা পাই *মডার্ন রিভিউ*-এর পাতায়। এক্ষেত্রে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের পৌষে *প্রবাসী*-র *বিবিধ প্রসঙ্গ*-এ প্রকাশিত রামানন্দ-প্রদত্ত তালিকাটি তুলে ধরছি :

The Far Off ('সুদূর') — February, 1912

Sparks from the Anvil ('কণিকা' হইতে) — April, 1912

The Infinite Love ('অনন্ত প্রেম') — September, 1912

The Small — September, 1912

Youth — September, 1912

Inutile — November, 1912

Poems ('কণিকা' হইতে) — November, 1912

এই অনুবাদগুলির হস্তলিপি (রবীন্দ্রনাথের) সযত্নে রক্ষা করেছিলেন রামানন্দ। *মডার্ন রিভিউ*-এর ব্যাপারে বিশেষ করে বলতে হয় ১৯১২ সালের

আরো দুই বৎসর তিনি বেঁচেছিলেন। তবে পীড়িত, যন্ত্রণাক্লিষ্ট অবস্থায়। ...১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর বাবা পরলোকগমন করেন। আশা হয় মনে, তাঁর বন্ধুর সান্নিধ্য হয়ত আবার লাভ করেছেন।' (*পিতৃস্মৃতি*, সীতা দেবী, উৎস : *প্রবাসী ষষ্টি বার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ*, চৈত্র, ১৩৬৭ ব.)।

৬

ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক চার পুরুষের। ত্রিপুরার প্রথম প্রগতিশীল শাসক মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের সঙ্গে বালক রবির যে সখ্যতার সূচনা হয় তা কবিজীবনের শেষদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল মহারাজের প্রপৌত্র ত্রিপুরার শেষ গৌরবময় রাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতার মধ্যে দিয়ে। রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষে (১৯৬১) ত্রিপুরার আঞ্চলিক রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে সে রাজ্যের সঙ্গে কবিগুরুর পারম্পরিক ও পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে গোবিন্দনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও হিমাংশুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় *রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা* নামে একটি আকরগ্রন্থ প্রকাশের মুখ দেখে। কিছুদিন পরে তা ইংরেজিতেও প্রকাশিত হয়। (*Tripura's ties with Tagore,* Translated by Chiranjiv Kaviraj, 1969) এ সংক্রান্ত আরেকটি জরুরি লেখা—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের *রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা* (সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত *দেশ সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন*, ১৯৩৩-১৯৮৩; আনন্দ, ১৯৮৭)। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা-চর্চার আদিগুরু অবশ্যই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর *প্রবাসী* পত্রিকা। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের *প্রবাসী*-তে সত্তরতম রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে ১৯৩১ সালের ২৫ ডিসেম্বর ত্রিপুরার মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের চিত্র ও কলা প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনের সংবাদ ও ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা প্রকাশিত হয় (পৃ. ৫০৮)। পরবর্তীকালে স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজা হিসেবে শান্তিনিকেতনে তাঁর বিশ্বভারতী দেখতে আসা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণীটি প্রকাশিত হয় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের *প্রবাসীর* 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-এ (পৃ. ৬২৬)। ত্রিপুরা রাজ্যে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর একটি সংবাদ পরিবেশিত হয় *প্রবাসী*-তে, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় (পৃ. ২৫৪)।

অনেক সময়ে মনে হয়েছে অক্ষুব্ধ বিচারবুদ্ধির বিশুদ্ধতা রক্ষা হচ্ছে না। কিন্তু বরাবর দেখেছি, ঠিক করেই হোক, ভুল করেই হোক, সম্পাদক যা সত্য বলে মনে করেছেন, ভয়ে বা লোভে তার বিরুদ্ধাচরণ করেন নি।' (*সবুজপত্র*, আশ্বিন, ১৩৩৩, পৃ. ৩)

৪

শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসীরা ক্ষিতিমোহন সেনের সভাপতিত্বে রবীন্দ্র-পরিচয় সভা নামে একটি সমিতি গঠন করেছিলেন। কবির সত্তর বছরের জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁরা *জয়ন্তী-উৎসর্গ* নামে একটি স্মারক-গ্রন্থ প্রণয়নে উদ্যোগী হন। যাতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিত *রবীন্দ্রনাথ* শিরোনামা রচনাটি এই সংকলন ভুক্ত হয়েছে। *প্রবাসী*-তে (ফাল্গুন, ১৩৩৮, পৃ. ৬৯২) *জয়ন্তী-উৎসর্গ* গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনাকালে রামানন্দ-দুহিতা শান্তা দেবী ধরিয়ে দিয়েছিলেন—"শ্রীযুতরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক নিবন্ধটিতে কয়েকটি ভুল আছে,—যথা ৯ম পৃষ্ঠায় 'আচরণ' স্থলে 'আবরণ' এবং ১১শ পৃষ্ঠায় 'দৃঢ়' স্থলে 'দূর' ও 'ধরিয়াছেন' স্থলে 'করিয়াছেন' ছাপা হইয়াছে।" বলা বাহুল্য আমরা এই ভুলগুলি শুধরে নিয়েছি। কবির এই সত্তর বছরের জন্মোৎসব পালনের নেপথ্যে সক্রিয় ছিলেন রামানন্দ স্বয়ং। তাঁর সম্পাদনায় ওই বছর প্রকাশিত হয় প্রায় চারশো পাতার ত্রিশটি ছবি সমেত রয়্যাল সাইজের রবীন্দ্র-শ্রদ্ধার অনন্যসাধারণ নিবেদন *The Golden Book of Tagore* (A Homage to Rabindranath Tagore from India and the World in Celebration of his Seventieth Birthday)। দেশ-বিদেশের অজস্র মনীষী কলম ধরেছেন এতে। এর মধ্যে পাঁচ মনীষীর নাম উল্লেখ করছি যাঁদের 'মনীষীদের মনীষী' হিসেবেও অভিহিত করা যায়। এঁরা হলেন—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, রোমাঁ রোলাঁ, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, কোস্টেস প্যালামাস এবং জগদীশচন্দ্র বসু। প্রসঙ্গত, *প্রবাসী*-তেও এই উৎসবের সুদীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয় (দ্রষ্টব্য : *প্রবাসী*, মাঘ, ১৩৩৮, পৃ. ৫০৩-৫১৮)।

সম্পাদক হিসেবে এই গ্রন্থের দীর্ঘ-ভূমিকায় রবীন্দ্র-প্রতিভার মূল্যায়নে প্রয়াসী হন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। একজন লেখক হিসেবে কোনো সম্পাদকের

পরিবারবর্গকে লেখা রবীন্দ্রনাথের বহু চিঠি *প্রবাসী*-তে প্রকাশিত হয়। রামানন্দের *এমন কেউ নেই যাকে সব বলা যায়* প্রবন্ধটি আসলে রবীন্দ্রনাথের তাঁর স্ত্রী-কে লেখা চিঠিপত্রগুলিকে কেন্দ্র করে। ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে কবির জন্মদিনকে উপলক্ষ করে রবীন্দ্র-লিখিত চিঠিপত্রের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে কবিগুরুর তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবী-কে লেখা ছত্রিশটি চিঠি মুদ্রিত হয়। ১৯০২ সালে কবিপত্নীর প্রয়াণের পরে এই চিঠিগুলি তাঁর দৃষ্টিগোচর হয় এবং তিনি আমৃত্যু সেগুলি রক্ষা করেন। এছাড়াও মৃণালিনী দেবীর লেখা তিনটি চিঠিও মুদ্রিত হয়েছিল এর প্রথম সংস্করণে। ১৩৭২ বঙ্গাব্দে চিঠিপত্রের প্রথম খণ্ডের নবতর সংস্করণে মৃণালিনী দেবীর লেখা আরও পাঁচটি পত্র সংযোজিত হয়। বহুদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে লিখিত তাঁর স্ত্রী-র কোনো পত্রের হদিশ পাওয়া যায়নি। ১৪০০ বঙ্গাব্দে চিঠিপত্রের প্রথম খণ্ডের যে আরও একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাতে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত মৃণালিনী দেবীর দুটি চিঠি সংযোজিত হয়। আসলে কন্যা মাধুরীলতা-কে লিখিত দুটি পৃথক পত্রে তিনি তাঁর স্বামীর উদ্দেশে যে চিঠিদ্বয় লেখেন তাই উদ্ধৃত হয় ওই সংস্করণে।

কবি-পত্নীর সঙ্গে রামানন্দের চাক্ষুষ আলাপ কোনোদিন হয়নি। অবশ্য কবির তাঁর স্ত্রী-কে লেখা পত্রে এলাহাবাদে আসার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। যে সফরে এসে তিনি রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় সেরে এসেছিলেন, যা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। কবি-জায়ার সম্পর্কে রামানন্দ হেমলতা দেবীর (রবীন্দ্রনাথের ভাইপো দ্বীপেন্দ্রনাথের স্ত্রী) থেকে অনেক বিষয়ে অবহিত হতেই পারেন। হেমলতা দীর্ঘদিন ধরে *প্রবাসী*-তে কবিতা লিখেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন এবং 'সংকলন ও সমালোচন' বিভাগেও কলম ধরেছেন। তাঁর সম্পাদিত *বঙ্গলক্ষ্মী* পত্রিকাতেও রামানন্দ প্রায়-ই লিখতেন। এই সুসম্পর্কের কথা মাথায় রেখে অনুমান করতে দ্বিধা নেই যে রামানন্দ এ বিষয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের অভাব এভাবেই মিটিয়েছিলেন। পাশাপাশি উল্লেখ করতে হয় মৈত্রেয়ী দেবীর কথা। ইনিও কবি-পত্নীকে দেখেননি; কিন্তু স্বীয় ভার্যার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বহুকথা বলেছেন। যা ধরা রয়েছে মূলত *মংপুতে রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থে (বিশ্বভারতী, ১৯৪৩)। *মংপুতে* নাম দিয়ে যা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় *প্রবাসী*-তে এবং যে গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন রামানন্দবাবু নিজেই।

মর্মস্থলে প্রবেশের শক্তিতে, দেশহিতের সত্যপথ নির্দেশে ও তাহার অনুসরণে, দার্শনিক তত্ত্বের মর্মোদ্ভেদে, আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে, জীবনকে বিশ্বনিয়মের ও বিশ্ববৈচিত্র্যের সহিত সকল দিক দিয়া সমঞ্জসীভূত করিবার সাধনায়, তাঁহার যে অসামান্য ও বহুমুখী শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, অতীত ও বর্তমান কালের অন্য কোনো মানুষে একাধারে তাহা দেখা গিয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। ইহার দ্বারা আমরা তাঁহাকে জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ বলিতেছি না; তাঁহার কোনো অসম্পূর্ণতা নাই, তাহাও বলিতেছি না। এক একটি বিষয়ে তাঁহার অপেক্ষা প্রতিভাশালী ও শক্তিমান অন্য অনেকে ছিলেন ও আছেন। আমরা কেবল এই বলিতেছি যে, তাঁহার মত বিচিত্র শক্তিমান পুরুষ বিরল।'

রবীন্দ্রনাথের আটাত্তরতম জন্মদিনে কলকাতার রেডিয়ো-তে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যে বক্তৃতা দেন তা ওই বছরের (১৯৩৮ খ্রি.) জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় লিপিবদ্ধ হয় *প্রবাসী* পত্রিকায়। *মডার্ন রিভিউ*-তেও যে সেই বছরের জুনে তা ইংরেজি ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছিল সেটা আগেই বলেছি।

৫

রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ রামানন্দকে দিশেহারা করে দিয়েছিল। তার কিছু বছর আগেই তিনি হারিয়েছিলেন স্ত্রী মনোরমাকে (৩১ আষাঢ়, ১৩৪২ ব.)। যে জগতের কল্পনা তিনি কখনও করেননি সেই জগৎ-ই তাঁকে দেখতে হওয়ায় তাঁর হৃদয়াবেগের শোকাচ্ছ্বাস ছাপিয়ে গিয়েছিল *মডার্ন রিভিউ* ও *প্রবাসী*-র পাতায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লেখা আরেকটি মূল্যায়ন-নির্ভর অপেক্ষাকৃত বড়ো প্রবন্ধে। রামানন্দ-তনয়া সীতা দেবীর স্মৃতিচারণার বিশেষ মূল্য রয়েছে এক্ষেত্রে : 'রবীন্দ্রনাথ বাবার চেয়ে চার বৎসরের বড়ো ছিলেন। তিনি বাবার দুই বৎসর আগে দেহত্যাগ করেন। তাঁকে শেষ ব্রহ্মনাম শুনিয়ে আসার পর বাবার যা মূর্তি দেখেছিলাম, তা এখনো মনে পড়ে। শোকের যে কালো ছায়া তাঁর মুখে সেদিন পড়ল, তা আর তাঁর জীবনান্ত কাল পর্যন্ত অপসারিত হয়নি। শ্মশানযাত্রা দেখতে তিনি যাননি, তবে রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে অনেক স্থানে আচার্যের কাজ করেছিলেন, যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের এখনো মনে আছে হয়ত। মনে হত, তাঁর প্রিয়তম বন্ধুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাবার আত্মাও যেন সহমরণে চলে গিয়েছিল।

মাঘ। কলকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে এটি মুদ্রিত হয়। এর বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : ‘এই কাব্য গ্রন্থখানি বালক-বালিকাদিগের পাঠের জন্য রচিত হইয়াছে। পরীক্ষার দ্বারা জানিয়াছি ইহার ছন্দ শিশুরা সহজেই আবৃত্তি করিতে পারে।’ রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : “তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) সন্তানদের শিক্ষা-সহায় গ্রন্থের অভাব অনুভব করিয়া এইটি (নদী) লেখেন। বাংলা-ভাষায় যুক্তাক্ষর-হীন কবিতা তখন খুবই কম—অক্ষয়চন্দ্র সরকার রচিত ‘গোচারণের মাঠ’ (১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ) একমাত্র সুপরিচিত কাব্য। শিশুদের কল্পনাশক্তি উদ্রিক্ত ও ছন্দ-সৌন্দর্য উপভোগের জন্য নূতন কাব্যসৃষ্টির প্রয়োজনবোধে এই নদী লিখিত হয়।” (*রবীন্দ্র-জীবনী*, প্রথম খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী, ১৪০১ ব.)। তিনি ইন্দিরা দেবীর কাছে এও শুনেছিলেন যে, *নদী* কবিতাটির সঙ্গে রবার্ট সাদি লিখিত *ফলস্ অভ ল্যাডোর* নামে কবিতার মিল আছে; সেটি নানা ছন্দে, ঝরনার ইতিহাসপূর্ণ কবিতা। সাদি নাকি তাঁর সন্তানদের জন্য কবিতাটি লিখেছিলেন। (তদেব)

পরবর্তী সময়ে রামানন্দ একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন : ‘যে জাতি বড়ো হইতে চায়, তাহাকে শিশুদের খবর রাখিতে হইবে।’ (*প্রবাসী*, মাঘ, ১৩২২, পৃ. ৩৩৬)। এই যাঁর মনস্তত্ত্ব তিনি যে *নদী* কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করবেন তাতে আর নতুনত্ব কী? তখন (১৮৯৬ খ্রি.) তিনি *দাসী* পত্রিকার সম্পাদক। দাসাশ্রমের সমাজসেবার হাজারও ব্যস্ততার মধ্যেও শিশুদের বাদ দিয়ে এই সেবাকার্য যে সম্ভব নয়, তা বুঝতে তাঁর দেরি হয়নি। শিশু সাহিত্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি তখন *মুকুল* পত্রিকার প্রায়-নিয়মিত লেখক। শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত এই শিশু-পাঠ্য পত্রিকাটির নেপথ্য-পরিচালকও তিনি। *নদী* কবিতাটির সমালোচনা-কালে রামানন্দের শিশু-ভাবনা তাঁর ভক্তদের একটি বড়ো পাওনা।

তবে *নদী*-র ১৩৭১ বঙ্গাব্দের স্বতন্ত্র সচিত্র সংস্করণটি (বিশ্বভারতী) তিনি দেখে যেতে পারলে খুব খুশি হতেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত এই গ্রন্থের পাতায় পাতায় চিত্র (যে অলংকরণ তিনি এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পরেই করেছিলেন এবং এই অলংকৃত পৃষ্ঠাগুলি তাঁর দৌহিত্রদ্বয় মোহনলাল ও শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে পরবর্তীকালে উদ্ধার হয়) এবং

কলকাতার টাউন হলে সপ্তরতম রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে চিত্র ও কলা প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করতে ত্রিপুরার মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর এলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতায় নিজের ছেলেবেলার সুখস্মৃতি উল্লেখ করে বলেন : 'অল্প বয়সে যখন আমি মাসিক কাগজে লিখিতাম, তখন একদা বর্তমান মহারাজার (বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর) প্রপিতামহের (বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর) নিকট হইতে একজন দূত আসিয়া আমাকে বলেন যে, আমার লেখা পড়িয়া মহারাজা সুখী হইয়াছেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমাকে তখন কার্সিয়াঙে নিমন্ত্রণ করা হয়। তথায় গেলে মহারাজা আমাকে পরম আগ্রহে অভ্যর্থনা করেন। তিনি আমাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং আমার রসসৃষ্টির প্রশংসা করিয়াছিলেন। বর্তমান মহারাজার পিতামহের সহিত আমার বন্ধুত্ব ছিল। তিনি রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত বিষয়েও আমার পরামর্শ চাহিতেন। আমি তাঁহাকে যথাশক্তি পরামর্শ দিতাম। প্রাচীন ভারতে রাজন্যবর্গই চিত্রকলা, সঙ্গীত, কাব্য ইত্যাদির পোষক ছিলেন। বর্তমানে এ বিষয়ে দেশীয় নৃপতিগণের তাদৃশ অনুরাগ দেখা যায় না। তথাপি ত্রিপুরা রাজপরিবারে কলাবিদ্যার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়, ইহা বড়োই আনন্দের কথা।' (*প্রবাসী*, মাঘ, ১৩৩৮, পৃ. ৫০৮)।

এনিয়ে রামানন্দের এই গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধটির মূলসূত্র ত্রিপুরা রাজপরিবারের সদস্য কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববর্মন ছিলেন কবির ভাইপো বলেন্দ্রনাথের সহপাঠী ও সেইসূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। এবং ত্রিপুরা ও কবিগুরু-কে নিয়ে বহু প্রবন্ধের লেখকও তিনি।

৭

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশায় নিজের লেখা চিঠিপত্রগুলোকে তিনভাবে গ্রন্থভুক্ত করেন। ইন্দিরা দেবী-কে লেখা চিঠিগুলোকে *ছিন্নপত্র* নাম দিয়ে, রাণু অধিকারীকে লেখা চিঠিগুলি *ভানুসিংহের পত্রাবলী* এবং রানী মহলানবীশকে লেখা চিঠিগুলি নিয়ে *পথে ও পথের প্রান্তে* নামে চিঠিপত্রের তিনটি খণ্ড প্রকাশ করেন। এই চিঠিপত্রগুলি বিশেষ স্থানের ও বিশেষ সময়ের দ্যোতক। তাঁর প্রয়াণের পর বিভিন্নজনকে লেখা চিঠিপত্র বিশ্বভারতী থেকে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর লেখা বহু চিঠিপত্র বিশেষ করে রামানন্দ ও তাঁর

সমাপ্তি করা যাক : 'অর্থই তো একমাত্র আনুকূল্যের উপায় নয়। প্রবাসী সম্পাদক সর্বদা তাঁর লেখার দ্বারা, নিজের দ্বারা, পরামর্শ দ্বারা, মমত্বের বহুবিধ পরিচয়ের দ্বারা বিশ্বভারতীর যথেষ্ট আনুকূল্য করেছেন। আমি নিশ্চিত জানি সেই আনুকূল্য দ্বারা তিনি আমার এই অতিভারপীড়িত আয়ুকেই রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। দুঃসাধ্য কর্তব্যভারে অর্থদানের চেয়েও সঙ্গদান, প্রীতিদান অনেক সময় বেশি মূল্যবান। সুদীর্ঘকাল আমার ব্রতযাপনে আমি কেবল যে অর্থহীন ছিলেম তা নয়, সঙ্গহীন ছিলেম, ভিতরে বাহিরে বিরুদ্ধতা ও অভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একা সংগ্রাম করে এসেছি। এমন অবস্থায় যাঁরা আমার এই দুর্গম পথে ক্ষণে ক্ষণে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা আমার রক্তসম্পর্কগত আত্মীয়ের চেয়ে কম আত্মীয় নন, বরঞ্চ বেশি। বস্তুত আমার জীবনের লক্ষ্যকে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার দৈহিক জীবনকেও সেই পরিমাণে আশ্রয় দান করেছেন। সেই আমার স্বল্পসংখ্যক কর্মসুহৃদদের মধ্যে প্রবাসী সম্পাদক অন্যতম। আজ আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।' (*সবুজপত্র*, আশ্বিন, ১৩৩৩, পৃ. ৬-৭)। শাশ্বত সম্পর্কের নির্মলতাকে কোনো মলিনতা ছুঁতে পারে না। রবীন্দ্র-রামানন্দ সম্পর্ক এই তত্ত্বের অবশ্যই সেরা হাতিয়ার। যা আজও সজীব। তাই রামানন্দের জন্মসার্ধশতবর্ষের শুভলগ্নে তাঁর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত বাংলা ভাষায় রচিত মৌলিক প্রবন্ধগুলি এই প্রথমবার মলাটবদ্ধ করার প্রয়াস গৃহীত হল।

২৫ ডিসেম্বর, ২০১৪ **অর্ণব নাগ**

কৃতজ্ঞতা : এই সংকলন-গ্রন্থটি সম্পাদনার ক্ষেত্রে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন রবীন্দ্র-গবেষক শ্রীতপোব্রত ঘোষ। তাঁর প্রতি আমার সবিশেষ কৃতজ্ঞতা।

চিঠিপত্রের দ্বিতীয় খণ্ডটি কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা কবির চিঠি দিয়ে সাজানো। ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে বিশ্বভারতী থেকে পুলিনবিহারী সেনের অধ্যক্ষতায় এটি প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গেই রামানন্দ লিখেছেন 'রবীন্দ্রনাথের ''চিঠিপত্র'' দ্বিতীয় পুস্তক'। এতে রথীন্দ্রনাথকে লেখা কবির পঞ্চাশটি চিঠি আছে বলে রামানন্দ উল্লেখ করলেও প্রকৃত চিঠির সংখ্যা আটচল্লিশ। বর্তমানে সুপ্রিয়া রায় সম্পাদিত সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের তাঁর পুত্রকে লেখা ১৭৩টি চিঠি ও রথীন্দ্রনাথের লেখা ৮টি চিঠি সংযোজিত হয়েছে।

রামানন্দের প্রয়াণে *বিশ্বভারতী পত্রিকা*-য় *আশ্রমবন্ধু* শীর্ষক সম্পাদকীয় স্তম্ভে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখেন এই অমূল্য কথাগুলি : 'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে দীর্ঘকাল প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ রবীন্দ্র-বাণীর প্রধান বাহন হতে পেরেছিল। মডার্ন রিভিউ-এর পৃষ্ঠাতেই রবীন্দ্রনাথের রচনা পাঠ করে—বিদেশি গুণীরা রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শুধু যে সাগ্রহে রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা, গান, উপন্যাস, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, ছবি সংগ্রহ করে তাঁরা এই পত্রিকা দুটির পরিপুষ্টি সাধন করেছেন তা-ই নয়, সুপরিচিত ও অপরিচিত বহু সাময়িকপত্র থেকে রবীন্দ্র-রচনা এই দুটি কাগজে সংকলন করে এসেছেন, তার মূল্য এখন উপলব্ধি করা যাচ্ছে—এইসব সাময়িকের অনেকগুলি এখন দুষ্প্রাপ্য, অনেকগুলি অল্পদিন মাত্র স্থায়ী হয়েছিল এবং এখন কোথাও তার কোনো চিহ্ন নেই, ফলে সম্পূর্ণ রবীন্দ্র-রচনা সংকলনের কাজে এই পত্রিকা দুটি এখন অমূল্য সহায়। বস্তুত রবীন্দ্রচর্চা ও রবীন্দ্রজীবনের আলোচনা প্রবাসী, মডার্ন রিভিউ-এর সহায়তা ছাড়া সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভবই নয়। দেশে ও বিদেশে রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত সামান্যতম ঘটনার উল্লেখও এই পত্রিকা দুটিতে সসম্মানে স্থান পেয়েছে—রবীন্দ্রজীবনের অনেক প্রয়োজনীয় বিবরণ অন্য কোথাও আজ তার পাবার উপায় নেই।' (*বিশ্বভারতী পত্রিকা*, মাঘ-চৈত্র, ১৩৫০ ব., পৃ. ৩৩৩)

৮

প্রিয় ভাইপো বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শুভ পরিণয় দিনে', তাঁর হাতে উপহার তুলে দিতে রবীন্দ্রনাথের *নদী* কবিতাটি গ্রন্থবদ্ধ হয় ১৩০২ বঙ্গাব্দের ২২

বি ষ য় ক্র ম

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী অঙ্কিত প্রাসঙ্গিক স্বতন্ত্র চিত্র (প্রথম প্রকাশ : *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, কার্তিক-পৌষ, ১৩৭০ ব.) সংবলিত হয়ে *নদী*-র নবতর সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত, *নদী* মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্য-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত *শিশু* গ্রন্থে (১৩১০ ব.) সংকলিত হয়েছিল।

৯

পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন (২ ডিসেম্বর, ১৮৮০—১২ মার্চ, ১৯৬০) রবীন্দ্র-রামানন্দ সম্পর্ককে দীর্ঘদিন কাছ থেকে দেখেছেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে বাস করার সৌজন্যে। রামানন্দের সঙ্গে তাঁর যোগ-সূত্রটা বুঝতে আমাদের অসুবিধে হয় না। তাঁর জন্ম কাশী-তে। সেই অর্থে তিনি প্রবাসী বাঙালি। এই প্রবাসী বাঙালিদের কথা রামানন্দ যেভাবে ভেবেছেন আর কেউ সেভাবে ভাবেননি। প্রবাস (প্রয়াগ) থেকে প্রকাশিত বলে *প্রবাসী* নামকরণ হওয়া যে সচিত্র সাময়িকীটি রামানন্দ-পরিচিতির অন্যতম মাপকাঠি সেই পত্রিকায় প্রবাসী বাঙালি নিয়ে বহু প্রবন্ধের রচয়িতা তিনি। যেমন, *প্রবাসী বাঙ্গালীর নিবাস ও কার্য* (আশ্বিন, ১৩১১, পৃ. ৩০৮-৩১৩), *প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা* (পৌষ, ১৩১৪, পৃ. ৫২৬-৫২৭), *প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের প্রতি আমার নিবেদন* (ফাল্গুন, ১৩৩০, পৃ. ৫৮৫-৫৯৭) ইত্যাদি। প্রতি বছর প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের ছবি ও সংবাদ ঘটা করে *প্রবাসী*-তে প্রকাশিত হত। কারণ রামানন্দ বিশ্বাস করতেন : 'যাহাদের ভাষা এক, তাহারা যেখানেই থাকুক, তাহাদের পরস্পরের সহিত যোগ রক্ষা করা আবশ্যক।' (*প্রবাসী*, ফাল্গুন, ১৩৪০, পৃ. ৬৮৫)। এই প্রবাসী বাঙালিয়ানার সূত্রেই ক্ষিতিমোহনের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা। যা পরবর্তীতে আরও অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে উভয়ের শান্তিনিকেতনে বাসের সৌজন্যে। রামানন্দের প্রয়াণের পর ক্ষিতিমোহনের লেখা দুটি প্রবন্ধে *রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দবাবু* (*প্রবাসী*, মাঘ, ১৩৫০)-য় এবং *পুণ্যচরিত কথা* (*প্রবাসী*, পৌষ, ১৩৫০)-য় ছড়িয়ে রয়েছে দুই মহাজীবনের নানা মণি-মাণিক্য। অতি প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় প্রথমোক্ত রচনাটিকে এই সংকলনের পরিশিষ্ট-ভুক্ত করা হল।

রবীন্দ্র-রামানন্দ সম্পর্কের শংসাপত্র কবি স্বয়ং দিয়েছেন। তারপরে আমাদের আর কিছু বলার থাকতে পারে না। কবি-কথা দিয়েই প্রসঙ্গটির

রবীন্দ্রনাথ ও মাসিক পত্র

রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন ভিন্ন বয়সে নিজে যে-সব মাসিক পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার কোনটিই এখন আমার সম্মুখে নাই। তাহার মধ্যে অন্ততঃ কয়েকটি সংগ্রহ করিয়া তদ্বিষয়ে কিছু লিখিবার সময়ও নাই। এইজন্য কোন-কোনটির সম্বন্ধে আমার যাহা মনে হইতেছে তাহাই লিখিব।

রবীন্দ্রনাথের মাসিক পত্রে মুদ্রিত প্রথম রচনা ''জ্ঞান-প্রকাশ'' নামক মাসিকে বাহির হইয়াছিল। ঐ মাসিক বহুকাল লয় পাইয়াছে। ''ভুবনমোহিনী-প্রতিভা'' একটি সেকালের কোন নারী নামধারী পুরুষের জাল রচনা। রবীন্দ্রনাথ ইহার সমালোচনা ''জ্ঞান-প্রকাশে'' করেন। এই জাল তখনকার অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিককে ঠকাইয়াছিল, কিন্তু তরুণ রবীন্দ্রনাথকে ঠকাইতে পারে নাই।

তাঁহার ''বালক'' দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, যে, উহা তিনি যে-সব বালকদের জন্য বাহির করিয়াছিলেন, তাহাদের জ্ঞান বুদ্ধি রুচি সম্বন্ধে ধারণা তিনি তাঁহার নিজের বালক-কালের জ্ঞান বুদ্ধি রুচির মাপকাঠি অনুসারে স্থির করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণে উহা ''ভারতী''র সহিত মিলিত হইয়া ''ভারতী ও বালক'' নামে বাহির হইতে পারিয়াছিল।

তিনি ''ভারতী'', ''ভাণ্ডার'', ''সাধনা'' এবং ''বঙ্গদর্শন''-এরও সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শন সম্পাদন করিতেন, তখন আমার বয়স খুব কম। আমি তখন উহার পাঠক ছিলাম না। সুতরাং উহা কিরূপ কাগজ ছিল, সে-বিষয়ে অপর অনেকের মত আমার জানা থাকিলেও আমারই নিজের সাক্ষাৎজ্ঞানলব্ধ কোন মত নাই। প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পর অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে প্রথমে প্রকাশিত ও পরে পুস্তকাকারে পুনঃ প্রকাশিত কোন কোন

লেখকদের কিছু শিখিবার আছে। তাহা এই যে, কোন কাজকেই ড্রাজারী (Drudgery) বা গাধার খাটুনী বলিয়া অবজ্ঞা করা উচিত নহে।

কিছুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ সংকলন-বিভাগের ভার ত্যাগ করেন। তাহার একটা কারণ, ইংরেজী ম্যাগাজিনগুলির ক্রমাধোগতি, তাহাতে আর আগেকার মত হিতকর ও মনোহারী লেখা থাকিত না।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মাসিক পত্র সম্পাদককে অন্যের রচনার প্রত্যাশায় থাকিতে হয়। যাঁহারা কাগজ বাহির করেন, তাঁহাদের অনেকের কাগজ হয় এই কারণে অনিয়মিত হয়, কিম্বা তাঁহাদিগকে যা-তা কিছু দিয়া কাগজ ভর্তি করিয়া বাহির করিতে হয়। সম্পাদকের নিজেরই যদি নানারকম প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, সমালোচনা প্রভৃতি লিখিয়া কাগজ পূর্ণ করিবার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে বিপন্ন হইতে হয় না। দুঃখের বিষয়, এরূপ ক্ষমতা অল্প সম্পাদকেরই থাকিবার সম্ভাবনা। আমি যত সম্পাদকের বিষয় অবগত আছি, তাহার মধ্যে তিনি যত প্রকার উৎকৃষ্ট গদ্য ও পদ্য রচনার দ্বারা মাসিক পত্র অলঙ্কৃত করিতে পারেন, অন্য কেহ তাহা পারেন নাই। এইজন্য, অন্যের সাহায্য না পাইলেও নিয়মিতরূপে উৎকৃষ্ট ও নানা বিচিত্র রচনাপূর্ণ মাসিক পত্র বাহির করিবার সঙ্কল্প একমাত্র তিনিই করিতে পারিতেন। এরূপ সঙ্কল্প তিনি কখনও করিয়াছিলেন কি না জানি না; কিন্তু করিলে তাহা ব্যর্থ বা বিন্দুমাত্রও অশোভন হইত না।

রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত মাসিকপত্রগুলি সম্বন্ধে বলিবারও অনেক কথাই আছে। এখন হাল্কা রকমের দু'একটা কথা বলি। যখন "সাধনায়", "ক্ষুধিত পাষাণ" গল্পটি পড়িয়াছিলাম, তখন সেই মায়াপুরীর সম্বন্ধে ও তাহার অধিবাসিনী সুন্দরীর সম্বন্ধে কি যে ঔৎসুক্য ও কৌতূহল হইয়াছিল, বলিতে পারি না। কবি যাহার মুখ দিয়া গল্পটি বলাইতেছিলেন, সেই লোকটি কৌতূহলকে চরম সীমায় উপনীত করিয়া হঠাৎ গাড়ীতে উঠিয়া যাওয়ায় অনতিক্রান্তযৌবন পাঠকের মন কবির প্রতি প্রসন্ন হয় নাই। গল্পটি পড়িয়া শেষ করিয়াছিলাম অনেক রাত্রে। সে-রাত্রে ঘুম হইয়া থাকিলে কখন হইয়াছিল মনে নাই। 'বিনি পয়সার ভোজ' যখন রবীন্দ্রনাথের কাগজে পড়ি, তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে। তখন আমরা কয়েক পরিবার বেনিয়াটোলার

এইরূপ নিয়মনিষ্ঠা সম্পাদক ও লেখক উভয় পক্ষেরই থাকা একান্ত আবশ্যক। যদি রবীন্দ্রনাথ বরাবর কোন-না-কোন মাসিকের সম্পাদক থাকিতেন বা থাকিতে বাধ্য হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা এই কাজ উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হইত। তাহার আর-একটি কারণ এই যে, তিনি সাময়িক ঘটনা সম্বন্ধে সামান্য কিছু লিখিলেও তাহাতেও সাহিত্যরস থাকে। যাহা হউক, সুখের বিষয়, সম্পাদকের কাজ তিনি কখনও কখনও করিয়া অন্যের পক্ষে পথপ্রদর্শক হইয়াছেন কিন্তু উহাতে অনর্থক বরাবর নিজের শক্তি ক্ষয় করেন নাই। কারণ, সম্পাদকের কাজ প্রতিভাশালী মনীষীদের কাজ নহে; শ্রমপটু সাধারণবুদ্ধিবিশিষ্ট লোকদের দ্বারাই উহা চলিতে পারে।

উৎস : *শান্তিনিকেতন*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩; পুনর্মুদ্রণ : *প্রবাসী* ('কষ্টিপাথর') ভাদ্র, ১৩৩৩। আমরা দেখেছি *প্রবাসী*-র মুদ্রণ। পৃ. ৭৫৪-৭৫৬।

বহি পড়িয়াছি। কিন্তু তাহা হইতে তাঁহার বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে ঠিক কোন মত প্রকাশ করা যায় না। যে-সকল বাংলা মাসিকপত্র সম্বন্ধে আমার সাক্ষাৎ জ্ঞান আছে, তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ''সাধনা''কে আমি প্রথম স্থান দিয়া থাকি।

তাহার কারণ শুধু উহাতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখাগুলির উৎকর্ষ নহে। সমস্ত কাগজখানির উপরই তাঁহার ব্যক্তিত্বের ও লিখন-ভঙ্গির ছাপ অনুভূত হইত—অন্ততঃ আমার তাহাই মনে হইত। ইহার একটা কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রায় সমস্ত কাগজখানাই লিখিতেন। দ্বিতীয় কারণ পরে শুনিয়াছি—এবং আশা করি তাহা ঠিক শুনিয়াছি ও ঠিক মনে আছে। তিনি অন্য লেখকদের লেখা খুব সুধরাইয়া দিতেন; তাহাতে হয়ত অনেক লেখা প্রায় পুনর্লিখিত হইয়া যাইত। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের মত লেখকের লেখাও সংস্কৃত হইয়া তবে ''সাধনা''য় বাহির হইত।

সেদিন কোথায় যেন বঙ্কিমবাবু ও রবিবাবুর একটা তুলনা পড়িতেছিলাম। তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে লেখক বলিতেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদকরূপে অনেক লেখককে গড়িয়া পিটিয়া ''মানুষ'' করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু রবিবাবু তাহা করেন নাই। আমার বোধ হয়, লেখকের এই কথা অজ্ঞতা-প্রসূত। রবীন্দ্রনাথ নিজের কাগজগুলির সম্পাদকরূপে অনেক লেখককে উৎকৃষ্ট রচনার পথ নির্দেশ ত কার্য্যতঃ করিয়াইছেন, অন্য কাগজের সংস্রবেও বহু লোকের রচনার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন।

তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দীর্ঘকাল ''প্রবাসী''র ''সংকলন'' বিভাগের পরিচালক ছিলেন। আমি তাঁহাকে ইংরেজী অনেক মাসিক পত্র পাঠাইয়া দিতাম। তিনি তাহা হইতে ভাল ভাল প্রবন্ধ বাছিয়া শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের অধ্যাপক ও ছাত্রদিগকে তাহার সারসংগ্রহ ও অনুবাদ করিতে দিতেন। অনুবাদগুলি তাঁহার হাতে পৌঁছিবার পর সংশোধনের পালা আরম্ভ হইত। সংশোধন ও সংক্ষেপণ খুবই হইত; অনেক স্থলে প্রায় সমস্তটাই তিনি নিজে প্রত্যেক পৃষ্ঠার বাঁ-দিকের খালি জায়গায় লিখিয়া দিতেন। অসাধারণ প্রতিভাশালী লোকের এইরূপ সংকলন-কার্য্যের জন্য পরিশ্রম হইতে প্রতিভাশালী নবীন

ছাপা হয় নাই। বাংলা মাসিক পত্রে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা 'জ্ঞান-প্রকাশে' প্রকাশিত হয়। এই মাসিক বহুকাল লয় পাইয়াছে। "ভুবনমোহিনী প্রতিভা" সেকালের কোন নারী নামধারী পুরুষের একটি জাল রচনা। রবীন্দ্রনাথ 'জ্ঞান-প্রকাশে' ইহার সমালোচনা করেন। এই জাল তখনকার অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিকেও ঠকাইয়াছিল, কিন্তু যুবা রবীন্দ্রনাথকে ঠকাইতে পারে নাই।

পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের সম্পাদকতায় যখন সাপ্তাহিক হিতবাদী বাহির হইত, রবীন্দ্রনাথ তখন তাহাতে লিখিয়াছিলেন। পরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত যখন কলিকাতার গ্রে ষ্ট্রীট-স্থিত স্বীয় বাসভবন হইতে সুপ্রভাত নামক সাপ্তাহিক পত্র বাহির করেন, তখন তাহাতেও রবীন্দ্রনাথের লেখা বাহির হইয়াছিল। আমি তখন এলাহাবাদে চাকরী করিতাম এবং ঐ কাগজের তত্রত্য সৌখীন সংবাদদাতা ছিলাম।

রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি মাসিকের সম্পাদকতা করিয়াছেন, কবিতা প্রবন্ধ গল্প উপন্যাস চিঠি দিয়াছেন তার চেয়ে অনেক বেশী মাসিক পত্রে।

তাঁহার সম্পাদিত "বালক" সেকালে দেখিয়া আমার মনে হইত, যে, তিনি তাহা যে-সব বালকদের জন্য সম্পাদন করিতেন, তাহাদের রুচি জ্ঞান বুদ্ধি সম্বন্ধে ধারণা নিজের বাল্যের জ্ঞান বুদ্ধি রুচির মতই মনে করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণে, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য অভিপ্রেত "ভারতী"র সহিত তাহা পরে মিলিত হইয়া "ভারতী ও বালক" নামে বাহির হইতে পারিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বালক, ভারতী, ভাণ্ডার, বঙ্গদর্শন ও সাধনার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। সবুজপত্রের সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী; কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে লেখা জোগাইবার ভার বেশী পরিমাণে লইতে হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত সব কাগজের মধ্যে সাধনা শ্রেষ্ঠ, সেকালে আমার এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল। তাহা পরিবর্ত্তন করিবার কোন কারণ ঘটে নাই। সাধনার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ, তাঁহার লেখাতেই ইহার কলেবর অনেকখানি পূর্ণ হইত। তাছাড়া, অন্য যে-সব লেখা বাহির হইত, তাহার উপরও তাঁহারই ব্যক্তিত্বের ও লিখিবার সম্বন্ধে তাঁহার স্বকীয় ছাঁদের ছাপ অনুভব করিতাম। ইহার কারণ বোধ হয় এই, যে, তিনি অন্য লেখকদের লেখা খুব

লেনের একটি বাড়ীতে থাকিতাম। গল্পটি পড়িতে পড়িতে আমরা অতিমাত্রায় হাস্য-রসোন্মত্ত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের কর্ত্রীদিগের দ্বারা ভর্ৎসিত হইয়াছিলাম মনে পড়ে।

বঙ্গদর্শন সম্পাদন করিবার সময় রবীন্দ্রনাথ একটি আলোচনা সভা স্থাপন করেন। তাহার নাম ভুলিয়া গিয়াছি। তখন উহার আফিস ছিল ২০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ভবনে। ঐ আফিসে বহু সাহিত্যিকের আড্ডা জমিত। সভার অধিবেশনে কোন-একটি বিষয়ে প্রবন্ধ পঠিত হইবার পর আলোচনা হইত। এরূপ সভার প্রয়োজন এখনও আছে।

নিজের মাসিক পত্র সম্পাদন ও তাহাতে নিজে লেখা ছাড়া তিনি অন্য যত মাসিকে লেখা দিয়াছেন, তাহার সবগুলির নামও আমি জানি না। এ বিষয়ে তিনি খুব মুক্তহস্ত। মাসিক পত্রের লেখকরূপে তাঁহার একটি গুণের সাক্ষ্য ভুক্তভোগী সম্পাদক আমার দেওয়া উচিত। তাহা বলিবার পূর্ব্বে তাঁহার অন্যতম অগ্রজ স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আশ্চর্য্য নিয়ম-নিষ্ঠার কথা বলা উচিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বহু ক্রমশঃ প্রকাশ্য লেখা প্রবাসীতে দিয়াছিলেন। তাহার কোন কিস্তির জন্য কখনও অপেক্ষা করিতে বা তাগিদ দিতে হয় নাই। বরাবর মাসের ১লা কিংবা ২রা তাঁহার লেখা ডাকে আসিয়া পৌঁছিত। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বরাবর নিয়ম রক্ষা করিতেন। রবীন্দ্রনাথের "গোরা" উপন্যাস দুই বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল এবং উহার হস্তলিপি ক্রমে ক্রমে পাইয়াছিলাম; কিন্তু কখনও কোন কিস্তির জন্য অপেক্ষা করিতে হয় নাই। তিনি একবার দারুণ শোক পাইয়াও ঠিক তাহার পরদিন একটি কিস্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এরূপ ধৈর্য্য, সংযম ও নিয়ম-নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত বিরল। কবিরা বড় এলোমেলো ও খামখেয়ালী বলিয়া তাঁহাদের একটা বদনাম আছে। কিন্তু রবিবাবু কবি কি না সে-বিষয়ে কোন-কোন বাঙালী ও অবাঙালী গভীর গবেষকের সন্দেহ থাকিলেও মাসিক-পত্রের খোরাক জোগান সম্বন্ধে তাঁহার কোন নিন্দা করা চলিবে না। এবিষয়ে তাঁহার সময়নিষ্ঠা অনতিক্রান্ত। ইহা তাঁহার অকবিত্বের প্রমাণ বলিয়া উপস্থাপিত হইবার আশঙ্কা থাকিলেও আমাকে এই সাক্ষ্য দিতে হইল।

পারেন, যিনি স্বয়ং মাসিক পত্রের জন্য আবশ্যক সবরকম গদ্য ও পদ্য রচনা প্রচুর পরিমাণে জোগাইতে পারেন। এই যোগ্যতা বাংলা দেশে রবীন্দ্রনাথের যেমন দেখিয়াছি, আর কাহারও সেরূপ দেখি নাই। সাময়িক ঘটনা সম্বন্ধেও তিনি সেকালে যাহা লিখিতেন এবং এখন যাহা লেখেন, তাহাতেও সাহিত্যরস পাওয়া যায়। তাঁহার লেখা এক-একখানা পোষ্টকার্ডেও এই রস বিদ্যমান। এইজন্য তিনি ইচ্ছা করিলে একাই এক-একখানা কাগজ চালাইতে পারেন। তাহা যে তিনি করেন নাই, ভালই করিয়াছেন। কারণ, তাহা করিলে সাংবাদিক জগৎ লাভবান্ হইত বটে, কিন্তু শ্রেষ্ঠতর সাহিত্য তাঁহার প্রতিভার ফসল হইতে বঞ্চিত হইত।

সাংবাদিকদের একটা গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক। তাহা ঠিক সময়ে নিয়মিতরূপে লেখা জোগান। রবীন্দ্রনাথের এই গুণ আছে। তাঁহার অনেক লেখা ক্রমশঃ পাইয়া মাসে মাসে ছাপিয়াছি। কখনও তাঁহার জন্য বিলম্ব বা অনিয়ম ঘটে নাই মনে পড়িতেছে, গোরা উপন্যাসের একটি কিস্তি তিনি দারুণ শোক পাইবার পরদিনই লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

মাসিক পত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কি করিয়াছেন, এতক্ষণ তাহাই বলিলাম, কারণ মাসিক চালান আমার প্রধান কাজ বলিয়া এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে কোন কোন কথা আমার জানা আছে। এখন অন্য কিছু বলিব।

স্কটল্যাণ্ডের স্যাল্টন-নিবাসী ফ্লেচারের উক্তি বলিয়া এই একটি কথা চলিত আছে যে, কেহ যদি কোন জাতির গান এবং কথা ও কাহিনী রচনা করিতে যান, তাহা হইলে তাহার বিধি-ব্যবস্থা কে প্রণয়ন করে, তাঁহার তাহা খোঁজ লইবার আবশ্যক নাই। সোজা কথায় ইহার মানে এই দাঁড়ায় যে, জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় ইতিহাস লোকপ্রিয় সাহিত্যের দ্বারা যেভাবে ও যে পরিমাণে গঠিত হয়, বিধি-ব্যবস্থা দ্বারা তাহা হয় না। এই মতটির দ্বারা কবি প্রভাব সুন্দরভাবে প্রকটিত হইয়াছে। আমাদের দেশে রামায়ণ মহাভারত জাতীয় চরিত্রকে যে-ভাবে গড়িয়াছে, কোন্ শাসনকর্ত্তা নিজের প্রভাব সেই প্রকারে তেমন স্থায়ীভাবে বিস্তার করিতে পারিয়াছেন? রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট সাহিত্যের প্রভাব বাঙালীজাতির উপর কতটা পড়িয়াছে, তাহা আমরা সম্যক্ বুঝিতে না পারিলেও ভবিষ্যতে বুঝা যাইবে।

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন সাহিত্যিক ও অন্যবিধ নানা সাধনায় ও কর্ম্মে পরিপূর্ণ। ব্যক্তিত্বে ও প্রতিভায় জগতের শ্রেষ্ঠ মানবসমূহের মধ্যে তিনি গণনীয়। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন না, একটি প্রবন্ধে তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে সম্যক্ ধারণা উৎপাদন সম্ভবপর নহে। এইজন্য কেবল কয়েকটি বিষয়ে তাঁহার প্রতিভা ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিব।

যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই তিনি মাসিক পত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। পরে কোন কোন সাপ্তাহিক ও দৈনিক কাগজেও তিনি লিখিয়াছেন। আমি যতদূর অবগত আছি, প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার কোন ইংরেজী লেখা মুদ্রিত হয় নাই। ১৯১২ সালের গোড়ার দিকে আমি তাঁহাকে তাঁহার কোন কোন বাংলা কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করিতে অনুরোধ করি। তাহার পূর্ব্বে কেহ তাঁহাকে এরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন কি না জানি না। আমাকে তিনি অনিচ্ছা জানান, এবং এ-বিষয়ে তাঁহার শক্তিতে তখন তাঁহার বিশ্বাস ছিল না, তাহা আমি বুঝিতে পারি। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল। তিনি যদিও আমার অনুরোধের উত্তরে পরিহাস করিয়া লিখিয়াছিলেন,

> ''বিদায় দিয়েছি যারে নয়ন-জলে,
> এখন ফিরাব তারে কিসের ছলে?''

ছাত্রাবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সেই অবস্থার আনুষঙ্গিক ইংরেজী রচনার অভ্যাসকে তিনি বিদায় দিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার অন্তরের প্রেরণা তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিল না, তিনি কতকগুলি ছোট ছোট কবিতা ১৯১২ সালের গোড়ার দিকে অনুবাদ করিয়া, আমি অনেক বৎসর ইস্কুল মাষ্টারি করিয়াছিলাম বলিয়া, আমাকে দেখিতে দেন। এইগুলি আমি মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় প্রকাশিত করি। আমি যতদূর জানি ইহার পূর্ব্বে তাঁহার কোন ইংরাজী কবিতা অন্য কোথাও

তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা লক্ষিত হয়। নৃত্যকলার অনুশীলন দীর্ঘকাল ভদ্রসমাজ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। তিনি বালিকা ও নারীদের সুরুচিসঙ্গত নৃত্যকে আবার ভদ্রসমাজে স্থান দিয়াছেন। নৃত্য-শিক্ষাদানে তিনি সুনিপুণ, চিত্রকলায় তাঁহার কৃতিত্ব মানুষকে ভাবাইতেছে এখন তাঁহার প্রতিভা প্রচার কোন্ নূতন পথে যাইবে। উপাসনান্তে তিনি যে সকল উপদেশ দেন এবং না লিখিয়া মুখে মুখে যে-সব বক্তৃতা দেন, তাহাতে তাঁহার বাগ্মিতারও পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার সরস কথোপকথন সাতিশয় উপভোগ্য। তিনি পরিচিত অপরিচিত কত লোককে কত যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহার কোন হিসাব নাই। এইসব চিঠি বাংলা সাহিত্যের রত্ন।

তাঁহার রচিত স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশভক্তি বিষয়ক গানগুলি অতীব প্রাণস্পর্শী। ভারতবর্ষের ইতিহাস এরূপ যে, আমাদের জাতীয় সঙ্গীতে বীররসের সঞ্চার করিতে হইলেই ভারতবাসী কোন না-কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে মনকে উত্তেজিত না করিয়া বীরত্ব ব্যঞ্জক গান রচনা করা কঠিন। কিন্তু এরূপ গান সমগ্র জাতির পক্ষে কল্যাণকর এবং সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে প্রীতিকর ও উৎসাহবর্দ্ধক হইতে পারে না। তদ্দ্বারা সম্প্রদায়-বিশেষ ক্ষণিক উত্তেজনা, উৎসাহ ও তৃপ্তিলাভ করিলেও তাহা জাতিগঠনের অনুকূল হইতে পারে না। এই প্রকারের বীররসাত্মক গান রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন নাই, ভালই করিয়াছেন। কিন্তু তা বলিয়া বীরত্বসঞ্চারী কোন গানই যে তিনি রচনা করেন নাই, এমন নয়। সাহস, নির্ভীকতা, অপরের জন্য আত্মোৎসর্গ, স্বদেশবাসীর ও অপর মানবের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের বিকাশে ও প্রকাশে অটল বিশ্বাস, সকলের পক্ষে স্বাধীনতার সম্ভাবনায় বিশ্বাস, সর্ব্বদেশে মানব-প্রকৃতির অদম্যতায় বিশ্বাস, সত্য-ন্যায়-করুণার জয়ে বিশ্বাস, বিশ্বনিয়ন্তার মঙ্গলবিধানে বিশ্বাস, বীরত্বের প্রধান উপাদান। এইসব উপাদান তাঁহার ‘‘স্বদেশী’’ গানগুলিতে, ‘‘কথা ও কাহিনী’’-তে, ‘‘নৈবেদ্যে’’ ও অন্য অনেক রচনায় প্রচুর পরিমাণে আছে। ‘‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে’’, এ শিক্ষা তাঁহার মত আর কে দিয়াছে? আমাদের শৃঙ্খল অন্যে যত দৃঢ় করিবার চেষ্টা করে, আমাদের আভ্যন্তরীণ বন্ধন তত টুটিয়া যায়, এ শিক্ষা তাঁহার মত আর

সুধরাইয়া দিতেন, হয়ত সেগুলি অনেকটা তাঁহার দ্বারা পুনর্লিখিত হইত। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মত লেখকের লেখাও তাঁহার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া তবে 'সাধনা'য় বাহির হইত। বলিতে গেলে, তিনি অনেক লেখককে গড়িয়া-পিটিয়া মানুষ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে রচনার উৎকৃষ্ট পথ দেখাইয়া দিয়াছেন।

তিনি ইহা যে কেবল নিজের সম্পাদিত কাগজগুলির লেখকদের সম্বন্ধেই করিয়াছেন, তাহা নহে। প্রবাসীতে কিছুদিন ''সংকলন'' নাম দিয়া কতকগুলি লেখা বাহির হইত। এইগুলি বিলাতী ও আমেরিকান্ নানা মাসিক পত্রের নানা প্রবন্ধের আংশিক বা সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। এইরূপ কতক মাসিক শান্তিনিকেতনে আসিত। অনেকগুলা আমি কিনিয়া এবং স্বর্গীয় বামন দাস বসু মহাশয়ের নিকট হইতে লইয়া রবীন্দ্রনাথকে পাঠাইয়া দিতাম। তিনি তাহা হইতে প্রবন্ধ বাছিয়া শান্তিনিকেতনের কোন কোন অধ্যাপক ও ছাত্রকে পূর্ব্বোক্তরূপ অনুবাদ করিতে দিতেন। অনুবাদগুলি তাঁহার হাতে পৌঁছিলে তিনি কোন কোন অংশ বাদসাদ দিতেন, সংশোধন করিতেন। তাহার পর সেগুলি আমার নিকট আসিত। আমি অনেক সময় দেখিতাম, তিনি পাতাকে পাতা লম্বা কষি টানিয়া কাটিয়া দিয়া পাশে আগাগোড়া সমস্তটা স্বয়ং লিখিয়া দিয়াছেন। সংশোধন ও পরিবর্ত্তন ত' অনেক থাকিতই। তাঁহার মত অসাধারণ প্রতিভাশালী লেখকের এই লোকহিতৈষণাপ্রসূত পরিশ্রম হইতে নবীন লেখকদের ইহা শিখিবার আছে, যে, এরূপ কাজকেও ড্রাজারি বা ''গাধার খাটুনী'' মনে করা উচিত নয়।

প্রবাসীর ''সংকলন'' কেন বন্ধ হইল, তাহা জানিবার যোগ্য। কিছুকাল এই কাজ করাইয়া ও করিয়া কবি দেখিলেন ও আমাকে জানাইলেন, বিলাতী ও আমেরিকান্ ম্যাগাজিনগুলাতে হিতকর ও মনোহারী প্রবন্ধের অভাব লক্ষিত হইতেছে, অতএব সংকলনযোগ্য জিনিষ আগেকার মত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে না। বিলাতী ও আমেরিকান্ লোক প্রিয় ম্যাগাজিনগুলির এই অপকর্ষ হয়ত এখনও কায়েম আছে। হয় ত বলিতেছি এইজন্য যে, সেগুলির সহিত বহুকাল আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নাই।

কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর উৎকৃষ্ট লেখাই ছাপিব অথচ মাসিক পত্রটা ঠিক নির্দ্দিষ্ট দিনে বাহির করিব, এরূপ প্রতিজ্ঞা সেই সম্পাদকই করিতে

পারিলে, শৃঙ্খলা সৌন্দর্য স্বাস্থ্য ও ঐশ্বর্য্যে স্বদেশী চেষ্টায় স্বদেশকে বরেণ্য করিতে পারিলে পাশ্চাত্যের প্রাধান্য ও প্রভুত্ব দূর হইবে। এই প্রকার চেষ্টায় যে বাহ্য বাধা আছে, রবীন্দ্রনাথ তাহা দূর করা যে অনাবশ্যক মনে করেন, তাহা নহে। বাহিরের শৃঙ্খল ছিঁড়িতে তিনিও চান; কিন্তু ভিতরের শৃঙ্খল ছেঁড়াও অত্যাবশ্যক মনে করেন। এবং ভিতরের শৃঙ্খল ছিন্ন না হইলে বাস্তবিক বাহিরের অভাবও দূর হইবে না, মনে করেন। এইজন্য তাঁহার রাষ্ট্রনীতি স্বদেশবাসী প্রত্যেকের ও স্বদেশী সমাজের আভ্যন্তরীণ সুস্থতা সম্পাদনে ও শক্তিবর্দ্ধনে ব্যাপৃত। ভিতরে যে লোক প্রবৃত্তির, স্বার্থের, ভয়ের, অজ্ঞানতার ও কু-প্রথার দাস, বাহিরে তাহার বন্ধনমুক্ত হওয়া সুকঠিন হইলেও তাহা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে। অতএব জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের পথ ভিতরেও অন্বেষণ করা চাই। এই কারণে রাষ্ট্রনীতির রবীন্দ্রনাথ এবং ধর্ম্মাচার্য্য রবীন্দ্রনাথ অভিন্ন। লঘু চিত্ত ও অগভীর দৃষ্টি লোকেরা মনে করে, বিশ্বহিতৈষী ও বিশ্বপ্রেমিক হইলে স্বদেশহিতৈষী ও স্বদেশপ্রেমিক হওয়া যায় না। কিন্তু ইহা বুঝা তাহাদের পক্ষেও সোজা, যে, স্বদেশ বিশ্বের অন্তর্গত এবং সকলের হিত না হইলে স্বদেশের হিত হইতে পারে না। এইরূপ যে-সব লোক রবীন্দ্রনাথকে উপহাস-বিদ্রূপ করিয়াছে, তাহারা কৃপার যোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের স্বাজাতিকতা কখনও তাঁহার বিশ্বমানবিকতার বিরোধী ছিল না। বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও বঙ্গে প্রথম স্বদেশী প্রচেষ্টার যুগে তাঁহার স্বাজাতিকতাই সুস্পষ্ট হইলেও তাঁহার বিশ্বমানবিকতা, "বসুধৈব কুটুম্বকম্" ভাব, তাহার আগে হইতেই ছিল। তিনি প্রায় একত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, ১৩০৭ সালের ৩রা ফাল্গুন "প্রবাসী" শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করেন। তাহা "প্রবাসী"র ১ম সংখ্যা ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। তাহার প্রথম কলিটিতেও তাঁহার বিশ্বমানবিকতা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে। যথা—

"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।
পরিবাসী আমি যে দুয়ারে চাই,

তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ কবি ও গদ্য লেখক। জগতের শ্রেষ্ঠ লেখকদিগের মধ্যেও তিনি স্থান পাইয়াছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল বিভাগেই হাত দিয়াছেন, এবং যাহাতে হাত দিয়াছেন তাহাকেই অলঙ্কৃত করিয়াছেন এবং তাহাতে নূতন প্রাণের সঞ্চার করিয়াছেন—তাহাই তাঁহার অসামান্য প্রতিভার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বিশ্বসঙ্গীত শুনিয়াছেন, তাঁহার কবিতায় ও গদ্য রচনায় আমরা তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। নয়নগোচর রূপের জগৎ, সৌন্দর্য্যের জগৎ তিনি দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। অধিকন্তু তিনি ধ্বনির জগতের রূপ অনুভব করিয়া অন্যকেও তাহা অনুভব করাইবার অসামান্য শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। জন্মলব্ধ প্রতিভা, শিক্ষা, সাধনা, শোক তাঁহাকে বিশ্বনাথের বাণী শুনিতে সমর্থ করিয়াছে। তিনি পরব্রহ্মের প্রেরণায় তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া আমাদিগকে বিশ্বনিয়মের ও বিশ্বনিয়ন্তার সহিত যোগস্থাপন করিতে আহ্বান করিয়া আসিতেছেন!

তাঁহার মত মানবপ্রাণের নিগূঢ় মর্ম্মস্থলে পৌঁছিতে অল্প লেখকই পারিয়াছেন। মানুষের বাহ্য আচরণের আভ্যন্তরীণ কারণ তিনি অসামান্য দক্ষতার সহিত বিশ্লেষণ ও প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার কৃতিত্বে বাংলা সাহিত্য জাতীয় সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিশ্বসাহিত্যের সমশ্রেণীস্থ হইয়াছে। যে সকল আদর্শভাব ও চিন্তার স্পর্শ, প্রভাব ও শক্তি বিশ্বমানবকে প্রগতি ও উন্নতির জন্য, নূতন আলোকের জন্য, নবজীবনের জন্য চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, বাঙালীরা তাঁহার রচনার মধ্যে তাহা অনুভব করিয়াছে। বাংলা ভাষায় যদি কেবল তাঁহারই রচনা থাকিত, তাহা হইলেও ইহা বিদেশীদের শিখিবার যোগ্য হইত। কিন্তু তিনি কেবল সাহিত্যিক নহেন। চলিত কথায় যাহাকে গানের ওস্তাদ বলে, তিনি তাহা না হইলেও, সঙ্গীতে তিনি আশ্চর্য্য প্রতিভাশালী। তিনি যে কেবল ভগবদ্ভক্তি, স্বদেশ প্রীতি ও অন্য নানা বিষয়ক বহু সংখ্যক অতি উৎকৃষ্ট গান রচনা করিয়াছেন তাহা নহে; তিনি যে কেবল সুকণ্ঠে হৃদয়-বীণার সহিত মিলাইয়া ঐ সকল নানা ভাবের গান গাহিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে বহু বৎসর ধরিয়া মুগ্ধ করিয়া আসিতেছেন তাহা নহে; তিনি অধিকন্তু নূতন নূতন গানে, নূতন নূতন সুর দিয়া নিজ সঙ্গীত সৃষ্টি-নৈপুণ্য দ্বারা অনেক ওস্তাদকেও চমৎকৃত করিয়াছেন। কবিতা ও নাটক পাঠে ও আবৃত্তিতে, নাটক-অভিনয় দক্ষতায়, এবং লিখিত বক্তৃতা সভা-সমক্ষে পাঠে

ভুল জায়গায় লাগিয়া ছাত্র বেচারাকে আহত করে। মানুষের মত চিত্তবিশিষ্ট পদার্থকে লইয়া এমনতর পাইকারীভাবে ব্যবহার করিতে গেলে প্রভূত লোকসান হইবেই, সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজে সর্ব্বত্র তাহা প্রতিদিনই হইতেছে।”

জাতির অতীত ও বর্ত্তমান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শিশুদের সুশিক্ষা হইতে পারে না, কবির এই মত উপরে উদ্ধৃত কথাগুলি হইতে বুঝা যায়। এইজন্য তিনি ভারতের প্রাচীন তপোবন সমূহের শিক্ষার আধ্যাত্মিক ভিত্তিকে, প্রকৃতির এবং মানব-সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগকে, ইহার প্রাণ বলিয়া চিনিয়া লইয়াছেন। মানুষের ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ জাগ্রত করা ও রূপ দেওয়া তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীর অন্যতম উদ্দেশ্য। যে মানুষ রচনা করে, গড়ে এবং যে মানুষ জানে—মানুষের প্রকৃতির এই দুটি দিকেরই তিনি বিকাশ চান।

তাঁহার প্রতিভা তাঁহাকে শিক্ষক হইবার যোগ্যতা দিয়াছে। তাঁহার নানা বিষয়ক জ্ঞান তাঁহার এই যোগ্যতা বাড়াইয়াছে। অনেকে মনে করেন, মাকড়সা যেমন নিজের ভিতরের জিনিস হইতে জাল বুনে, কবি রবীন্দ্রনাথ তেমনি কেবল কল্পনার বলে কাল্পনিক জিনিস রচনা করিয়া কাল কাটান। কিন্তু বাস্তবিক তিনি যে কত রকমের বিজ্ঞান, ললিত-কলা, কারুকার্য্য, চাষবাস, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক বহি পড়িয়াছেন এবং এখনও পড়েন, তাহা অল্প লোকেই জানে। পৃথিবীর সকল মহাদেশ ভ্রমণ অধ্যয়নের মতই, তাঁহার জ্ঞান বাড়াইয়াছে।

অনেকে বয়োবৃদ্ধি-সহকারে সামাজিক কু-প্রথাদি বিষয়ে রক্ষণশীল হন। মতে ও আচার-আচরণে যাহা কিছু ভাল রবীন্দ্রনাথ তদ্বিষয়ে রক্ষণশীল, কিন্তু যাহা অনিষ্টকর তদ্বিষয়ে সংস্কার-প্রয়াসী। তাঁহার এই ভাব বয়োবৃদ্ধি-সহকারে বাড়িয়া চলিয়াছে।

উৎস : জয়ন্তী-উৎসর্গ, রবীন্দ্র-পরিচয়-সভা কর্তৃক ১১ পৌষ, ১৩৩৮-এ প্রকাশিত, পৃ. ৫-১৫।

কে দিয়াছে? ''বিধির বিধান ভাঙবে তুমি এমনি শক্তিমান্?''—এ প্রশ্ন তাঁহার মত দৃঢ় স্বরে আর কে করিয়াছে? তাঁহার রচনাবলীর অসামান্য সংযম ও সুষমা, এবং তৎসমুদয়ে বাহ্য ডাক-হাঁক, স্পর্ধা, বীরত্বোচ্ছ্বাস ও আস্ফালনের অভাব আমাদিগকে অনেক সময় ভুলাইয়া দেয় যে তাহাদের মধ্যে কিরূপ শান্ত সংযত আত্মসংবৃত অটল বীরত্ব নিহিত আছে।

তাঁহার হৃদয় ভারতবর্ষের অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের সকল বিভাগকে ভালবাসিয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা তিনি ঠিক ধরিয়াছেন।

তাঁহার স্বদেশপ্রেমে সংকীর্ণতা, অতীত গৌরবের অতিপূজা এবং বিদেশ ও বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষ-অবজ্ঞা নাই। ভারতবর্ষের বিশেষত্ব এবং বিধি নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কার্য্যে ও ভবিষ্যতে তিনি বিশ্বাস করেন। কিন্তু অন্যান্য দেশেরও যে এইরূপ বিশেষত্ব, বিশেষ কাজ ও ভবিষ্যৎ থাকিতে পারে, তাহা তিনি অস্বীকার করেন নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাকে তিনি অবজ্ঞা করেন না, অনাবশ্যকও মনে করেন না; বরং বিজ্ঞানচর্চ্চার দ্বারা জাগতিক সত্য ও নিয়ম আবিষ্কারে ও অন্য কোন কোন বিষয়ে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের কৃতিত্বকে তিনি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। কিন্তু তিনি চান না, যে, ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য দেশ সকলের একটা নিকৃষ্ট নকল মাত্র হয়—উৎকৃষ্ট নকল হয় তাহাও তিনি চান না। পশ্চিমের নিকট হইতে আমরা লইব, পশ্চিমও আমাদের নিকট হইতে লইবে। ভিক্ষুকের মত, পৈত্রিক সম্পত্তিহীন অনাথ বালকের মত আমরা প্রতীচীর প্রাসাদের দ্বারস্থ হইব না। আমাদেরও প্রকৃতিতে সর্ব্ববিধ মহত্ত্ব, সর্ব্ববিধ সাফল্য, সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যের বীজ নিহিত আছে। প্রতীচীর সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে যদি তাহা অঙ্কুরিত হয়, তাহাই প্রধান লাভ। আমরা আঁধার ঘরের বদ্ধ বাতাসে আবদ্ধ ছিলাম; যেমনভাবেই হউক, প্রতীচীর দ্বারা আমরা বাহিরের আলো, বাতাস, বাহিরের ঝঞ্ঝাবৃষ্টি, বাহিরের জনতার ঠেলাঠেলির মধ্যে আনীত হইয়াছি এখন হাত-পা ও মনটা স্বাভাবিক ও সতেজ হউক। প্রতীচী উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে নাই। তাহার আবির্ভাব আমাদেরই আভ্যন্তরীণ ব্যাধির ফল ও বাহ্য লক্ষণ। জোর করিয়া তাহাকে গলাধাক্কা দিতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা; তাহা সম্ভবপরও নহে। আমরা মানুষ হইলে, সুস্থ প্রকৃতি হইলে, স্বদেশকে বাস্তবিক স্ব-দেশ করিতে পারিলে, ভাবে চিন্তায় জ্ঞানে কার্য্যে জাতীয় জীবনের সকল বিভাগকে আপনাদের করিতে

সেই প্রাচীন ধারা রক্ষিত হয়েছে। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম-ভারতীয়-দার্শনিক-কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ায় এবং পরে বিলাতে হিবার্ট লেক্‌চ্যর্স্ দিতে আহূত হওয়ায় তাঁর দার্শনিকত্ব প্রকাশ্য ভাবে স্বীকৃত হয়।

তিনি সম্পাদক ও সাংবাদিকের কাজ দীর্ঘকাল অসামান্য প্রতিভা ও দক্ষতার সহিত ক'রেছেন, এবং ভবিষ্যতে-প্রসিদ্ধ অনেক লেখকের লেখা সংশোধন ক'রে তাঁদিকে সাহিত্যিক কৃতিত্ব লাভে সমর্থ ক'রেছেন।

তাঁর বহুমুখী প্রতিভার প্রশংসা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

টেনিসন ভিক্টর হিউগোকে বলেছেন, "Victor in Drama, Victor in Romance, Cloud-weaver of phantasmal hopes and fears", "Lord of human tears", "Child-lover" এবং "Weird Titan by thy winter weight of years as yet unbroken." আমরা রবীন্দ্রনাথকে এই সব এবং আরও অনেক বিশেষণে ভূষিত ক'রে সত্য বিজয়শ্রীমণ্ডিত ব'লে অনুভব ক'রতে পারি।

তাঁর গান এবং গীতরচনা তাঁর প্রতিভা ও শক্তির আর একটি দিক্। ধর্ম্ম, দেশভক্তি, প্রেম, প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি দু-হাজার বা আরো বেশী বহু ও বিচিত্র ভাবোদ্দীপক গান বেঁধেছেন ও তাতে সুর দিয়েছেন। বয়সকালে তাঁর গলাও ছিল চিত্তহারী, চমৎকার ও বিস্ময়কর। তিনি চলিত অর্থে ওস্তাদ নন্—যদিও ওস্তাদী গানের শিক্ষা তাঁর হয়েছিল ও ওস্তাদী তিনি বুঝেন। গানের কথা সৃষ্টি, সুর সৃষ্টি, এবং কণ্ঠে কথা ও সুরের সাহায্যে বহু বিচিত্র ধ্বনিরূপের সৃষ্টি—এই ত্রিবিধ কৃতিত্বের সমাবেশে এদেশ তাঁকে অদ্বিতীয় সঙ্গীতস্রষ্টা ব'লে মনে করি।

আমরা অনেকেই কেবল নয়নগোচর রূপ দেখি, রবীন্দ্রনাথ অধিকন্তু শ্রবণগোচর রূপও দেখেন। তাঁর গানগুলির দ্বারা তিনি বাংলা দেশকে গ'ড়ে আসছেন।

তিনি সুনিপুণ অভিনেতা এবং অভিনয়ের সুদক্ষ শিক্ষক। কবিতার আবৃত্তিতে এবং প্রবন্ধ গল্প নাটক ও উপন্যাসের পঠনে তিনি সুদক্ষ। সাধারণ কথাবার্ত্তায় তিনি সুরসিক। ভাব ও চিন্তার ব্যঞ্জক বহুবিধ সুরুচিপূর্ণ কলাসম্মত মনোজ্ঞ নৃত্যের তিনি স্রষ্টা ও শিক্ষক। দৈহিক সামর্থ্য যত দিন ছিল, নিজেও নৃত্যনিপুণ ছিলেন।

তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়,
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।"

বিশ্বভারতী স্থাপন দ্বারা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই বিশ্বপ্রীতিকে রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে নানা ভাগে বিভক্ত অথচ নিগূঢ় ঐক্যসূত্রে বদ্ধ ভারতীয় নানা কৃষ্টির সহিত ভিন্ন ভিন্ন দেশের কৃষ্টির যোগ ও সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা আছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ও জাতির মধ্যে বিরুদ্ধভাব দূর করিয়া সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা আছে। শান্তিনিকেতনে যাহা প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমরূপে স্থাপিত হয়, তাহাই বিশ্বভারতীর আকার ধারণ করিয়াছে। শিক্ষাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রতিভা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ১৩১৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী'তে ভগিনী নিবেদিতার সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লেখেন, তাহার মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার নিজের মতের সংক্ষিপ্ত আভাস আছে। কোন এক উপলক্ষ্যে ভগিনী নিবেদিতা তাঁহাকে বলেন, "বাহির হইতে কোনো একটা শিক্ষা গিলাইয়া দিয়া লাভ কি? জাতিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতারূপে মানুষের ভিতরে যে জিনিসটা আছে, তাহাকে জাগাইয়া তোলাই আমি যথার্থ শিক্ষা মনে করি। বাঁধা নিয়মে বিদেশী শিক্ষার দ্বারা সেটাকে চাপা দেওয়া আমার কাছে ভাল বোধ হয় না।"

নিবেদিতার এই মত সম্বন্ধে তাহার পর কবি লিখিতেছেন :— "মোটের উপর তাঁহার এই মতের সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য ছিল না। কিন্তু কেমন করিয়া মানুষের ঠিক স্বকীয় শক্তি ও কৌলিক প্রেরণাকে শিশুর চিত্তে একেবারে অঙ্কুরেই আবিষ্কার করা যায় এবং তাহাকে এমন করিয়া জাগ্রত করা যায় যাহাতে তাহার নিজের গভীর বিশেষত্ব সার্ব্বভৌমিক শিক্ষার সঙ্গে ব্যাপকভাবে সুসঙ্গত হইয়া উঠিতে পারে তাহার উপায় ত' জানি না। কোনো অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন গুরু এ কাজ নিজের সহজবোধ হইতে করিতেও পারেন, কিন্তু ইহা ত' সাধারণ শিক্ষকের কর্ম্ম নহে। কাজেই আমরা প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া মোটা রকমে কাজ চালাই। তাহাতে অন্ধকারে ঢেলা মারা হয়—তাহাতে অনেক ঢেলার অপব্যয় হয়, এবং অনেক ঢেলা

"অস্পৃশ্যতা"র বিরুদ্ধে আন্দোলন ব্রাহ্ম সমাজের জাতিভেদ-বিরোধী আন্দোলনের অন্তর্গত। এরই প্রেরণা স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে "গীতাঞ্জলি"র অন্তর্গত ২৮ বৎসর পূর্ব্বে রচিত সেই কবিতায় যার গোড়ায় আছে,

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হোতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হোতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

রাষ্ট্রশক্তির-সাহায্য-ও-পরিচালনা-নিরপেক্ষ ভাবে দেশের—বিশেষ ক'রে পল্লীর, হিতকর কাজ করবার প্রয়োজন ও পদ্ধতি তিনি অসহযোগ আন্দোলনের বহু পূর্ব্বে নির্দ্দেশ ক'রে নিজের জমিদারীতে ও সুরুলে তদনুসারে কাজ করিয়ে আস্‌ছেন।

আন্তর্জাতিকতা নামে অভিহিত তাঁর বিশ্বমানবপ্রেমের আভাস তাঁর অনেক আগের রচনাতেও পাওয়া যায়, কিন্তু স্পষ্ট পাওয়া যায় "প্রবাসী"র প্রথম সংখ্যার জন্যে ৩৮ বৎসর আগে লিখিত সেই কবিতায় যার গোড়ায় আছে,

"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া;
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।"

তিনি তাঁহার "ন্যাশন্যালিজ্‌ম্‌" নামক ইংরেজী গ্রন্থে সেই স্বাজাতিকতাই গর্হিত বলেছেন যা বিদেশ ও বিজাতির ধন গ্রাস করতে ও তাদের উপর প্রভুত্ব করতে চায়। পরদেশদ্রোহিতা না-ক'রে যে স্বাজাতিকতা স্বদেশের কল্যাণ করতে চায়, কথায়, কাব্যে, বক্তৃতায়, গানে ও কাজে চিরদিনই তিনি তার সমর্থক ও অন্যতম প্রধান অনুপ্রাণক। তাই তিনি ৩৭ বৎসর পূর্ব্বে "নৈবেদ্যে" প্রার্থনা করতে পেরেছিলেন,

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের কবি-পরিচয়ই শ্রেষ্ঠ পরিচয় হ'লেও তিনি কাব্য ছাড়া অন্য রকম পুস্তকও লিখেছেন বিস্তর। তাঁর কবিত্বের উন্মেষ হয় প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে, তাঁর শৈশবে বললেও চলে। পদ্যে তিনি যে-সব কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ লিখেছেন, তা ছাড়া তাঁর গদ্য কবিতা এবং গদ্য কাব্যও বহুসংখ্যক আছে। তাঁর উপন্যাস, নাটক ও গল্প—সবগুলিই কাব্য।

কাব্য ভিন্ন তিনি ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ, দর্শন, ছন্দ, গ্রন্থ সমালোচনা, বিদেশ ভ্রমণ প্রভৃতি বিষয়ে এত প্রবন্ধাদি লিখেছেন ও বক্তৃতা ক'রেছেন, যে, অল্প সময়ের মধ্যে সেগুলির নাম করাও সম্ভব নয়। তাছাড়া, তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-কৌতুক-পরিহাসাত্মক লেখা আছে, হেঁয়ালি নাট্য আছে, গীতি-নাট্য ও নৃত্যনাট্য আছে, ''পঞ্চভূতের ডায়ারী'' নামক পুস্তক আছে যাকে কোন শ্রেণীতে ফেলা সুকঠিন। তিনি যেমন প্রাপ্তবয়স্কদের, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের জন্যে লিখেছেন, তেমনি ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যেও গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ছড়া—এমন কি বর্ণ পরিচয়ের বহিও, লিখেছেন। বৈজ্ঞানিকদের তাঁরই কাছে তাঁরই বিরুদ্ধে একটি নালিশ ছিল, যে, তিনি বৈজ্ঞানিক কিছু লেখেন নি। গত বৎসর ''বিশ্বপরিচয়'' লিখে তিনি তাঁদের সে ক্ষোভ দূর করেছেন। এসব ছাড়া তাঁর নিজের লেখা ইংরেজী বহি অনেকগুলি আছে যেগুলি তাঁর বাংলা বহির অনুবাদ নয়। তাঁর বাংলা অনেক বহির অনুবাদ পৃথিবীর পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য যত অধিক ভাষায় হয়েছে, ভারতবর্ষের আর কোন লেখকের তা ত হয়ই নাই, অন্য কোন দেশেরও আধুনিক কোনও লেখকের হয়েছে বলে আমি জানি না।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে কবি ও দার্শনিক দুই পৃথক্ শ্রেণীর মানুষ ব'লে পরিগণিত হয়। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে একই মানুষকে কবি ও দার্শনিক রূপে—এমন কি, বৈজ্ঞানিক ও কবি রূপে, দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার

অনুভব করবেন; ভারতের ও অন্য সকল দেশের জ্ঞানের ও ভাবের প্রবাহ এখানে অবাধে প্রবাহিত হবে; সকলে শ্রদ্ধাবান্ ও শুচি থাক্‌বেন এক ও অসীমের কাছে মাথা নত ক'রে; এখানকার শিক্ষা শুধু পণ্ডিত প্রস্তুত করবে না, আত্মনির্ভরশীল উপার্জ্জকও প্রস্তুত করবে; শুধু জ্ঞানের চর্চা এখানে হবে না, সঙ্গীত চিত্রকলা-আদি সুকুমার কলার অনুশীলনও হবে; আবার, বস্ত্রবয়ন-আদি নানাবিধ কারুশিল্প ও কৃষি শিক্ষা দেওয়া হবে এবং গ্রামগুলিকে স্বাস্থ্যে সচ্ছলতায় সৌন্দর্য্যে আবার আনন্দের নিলয় করবার চেষ্টা হবে; অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীরা কেবল জ্ঞাতা ও জিজ্ঞাসু হবে না, কর্ম্মী ও স্রষ্টাও হবেন; বিদ্যার্থীরা ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে যথাসম্ভব স্বশাসক হবেন;—সংক্ষেপে বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য এইরূপ। এখানে ছাত্রছাত্রীরা পৃথক্ পৃথক্ আবাসে থেকে একত্র শিক্ষা লাভ করেন। ভারতবর্ষের সকল প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সংস্কৃতির অনুশীলন এখানে হয়। চীন তিব্বত প্রভৃতি বিদেশের সংস্কৃতি অনুশীলনও হয়। এখানে ছাত্রছাত্রীদের নানারকম ব্যায়াম ও খেলার ব্যবস্থা আছে, গ্রামসেবার সুযোগ আছে।

কবি বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা শুধু এ অর্থে নয়, যে, তিনি এর জন্যে টাকা দিয়েছেন, টাকা সংগ্রহ করেছেন, ঘরবাড়ী বানিয়েছেন; এই অর্থেও যে, তিনি এর জন্যে পরিশ্রম করেছেন—এখনও করেন; স্বয়ং ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে পরম নৈপুণ্য ও ধৈর্য্য সহকারে পড়িয়েছেন; গান, অভিনয়, নৃত্য, শিখিয়েছেন; তাদের সভায় সভাপতিত্ব করেছেন; তাদের গল্প ব'লে চিত্তবিনোদন করেছেন; তাদের সঙ্গে খেলা করেছেন; মন্দিরে উপাসনা ও বাচন দ্বারা অনুপ্রাণনা দিয়েছেন; তাঁর স্বর্গগতা সহধর্ম্মিণী প্রথম অবস্থায় নিজের অলঙ্কার এই প্রতিষ্ঠানকে দিয়েছেন এবং স্বহস্তে অধ্যাপক ও ছাত্রদেরকে দিনের পর দিন রেঁধে খাইয়েছেন।

কবি দ্বাদশ বার, পৃথিবীর নানা দেশে বেড়িয়ে ভারতের সহিত পৃথিবীর যোগ স্থাপন ও বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। তিনি পৃথিবীর জাতিসমূহের অন্যতম আন্তর বন্ধনরজ্জু এবং উদ্যোগী জগৎশান্তিকামী।

তাঁকে সবাই কবি ব'লেই জানে; তিনি যে কিরূপ পণ্ডিত, কত রকমের কত বই তিনি পড়েন, তা লোকে জানে না। কত বিষয়ের বই তিনি শুধু ইংরেজীতেই পড়েছেন ও পড়েন, ইংরেজীতে তার একটা ফর্দ দিচ্ছি।

প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে তাঁর প্রতিভার একটা নূতন দিক্ খুলে যায়। তা চিত্রাঙ্কন। তাঁর চিত্র পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য কোন শ্রেণীতে পড়ে না, কারো কাছে শেখা নয়। এ তাঁর নিজস্ব। তাঁর চিত্রাবলী সাধারণতঃ কোন গল্প বলে না ব'লে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ও উপভোগ্য না-হ'লেও বিদেশে ও এদেশে সমঝদারেরা এর গুণ মানেন।

বঙ্গের আধুনিক চিত্রকলার উৎপত্তি যে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রাণনা থেকে, সে সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বাংলার কবি (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ) আর্টের সূত্রপাত করলেন, বাংলার আর্টিষ্ট (অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথ) সেই সূত্র ধরে একলা একলা কাজ করে চল্লো কত দিন।"

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্যে তিনি যা করেছেন, অন্য কোন লেখক তা করেন নি। তাঁর লেখায় বাংলা সাহিত্য প্রাদেশিকতা ও দেশিকতা অতিক্রম ক'রে সমগ্র বিশ্বের দরবারে পৌঁছেছে। তার মধ্যে সমগ্র জাগতিক ভাব ও চিন্তার ধারা খেলছে, অথচ যা একান্ত বঙ্গের ও ভারতের, তাও তাতে আছে।

যদি কোন বিদেশী কেবল তাঁর লেখা পড়বার জন্যেই বাংলা শেখেন, তা হ'লেও তাঁর শ্রম সার্থক হবে।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পর স্বদেশী আন্দোলনে তিনি রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে কর্ম্মীরূপে নেমেছিলেন। যখন সন্ত্রাসনবাদ মূর্ত্ত হ'ল, তখন তার প্রকাশ্য প্রতিবাদ ক'রলেন। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে কর্ম্মী তিনি বেশীদিন রইলেন না। কিন্তু অন্যতম চিন্তানায়ক থাকলেন, এবং এখনও আছেন। জালিয়ানওয়ালা-বাগের কাণ্ডের প্রতিবাদ তিনিই প্রথম করেন ও নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। যে-সব সভায় তাঁর অধিনায়কত্বের প্রয়োজন হয়েছে, তাতে অল্প দিন আগেও তিনি সভাপতি হয়েছেন। এখনও তাঁর বাণী, উপলক্ষ্য ঘটলেই, সকল দেশভক্তকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে।

রাষ্ট্রকে অবস্থাবিশেষে কর দেওয়া বা না-দেওয়ায় প্রজাদের অধিকার, এবং স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব ও বন্ধন বরণ এবং তাঁহার গৌরব ও আনন্দ, তিনি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকে প্রথম এবং পরে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে "পরিত্রাণ" নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর মুখে ব্যক্ত করেন। *

---

* ইহার দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান সংখ্যার বিবিধ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

কিন্তু মৃত্যুকেও তিনি মাতৃহস্তের মতই স্নেহময় ও নির্ভরযোগ্য মনে করেন; তাই বলেছেন :—

"সে যে মাতৃপাণি,
স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি।
স্তন হতে তুলে নিলে শিশু কাঁদে ডরে,
মুহূর্ত্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।"

ইহলোক ও পরলোক বিশ্বজননীর দুই স্তন। মৃত্যুরূপ হাত দিয়ে তিনি মানুষকে ইহলোক-রূপ এক স্তনের পীযূষের পর পরলোক-রূপ অন্য স্তনের পীযূষ পান করান।

কবি সাধক। কিন্তু তাঁহার সাধনা বৈরাগ্যের পথে নয়। তিনি লিখেছেন :—

"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি' বারংবার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে।
ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ র'বে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তি রূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তি রূপে রহিবে ফলিয়া।"

উৎস : *প্রবাসী*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫, পৃ. ২৮১-২৮৪।

আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়;
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করে নি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।"

বাহ্য বন্ধন হ'তে মুক্তি তাঁর স্বাধীনতার আদর্শের নিশ্চয়ই অন্তর্গত; কিন্তু সামাজিক ও আন্তরিক সর্ব্ববিধ দাসত্ব হ'তে মুক্তি এর অস্থিমজ্জা।

ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের যে যে ব্যবহার নিন্দনীয়, তিনি তার তীব্র নিন্দা করেছেন, কিন্তু ইংলণ্ডের ও ইংরেজ জাতির গুণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

সেইরূপ, পাশ্চাত্য দেশসমূহের এবং তাদের রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির নিন্দনীয় দিক্‌গুলির নিন্দা তিনি করেছেন, কিন্তু তাদের বিজ্ঞানের ও জিজ্ঞাসুতার, জনসেবার ও সংস্কৃতির এবং মনুষ্যত্বকে সম্মানদানের যথাযোগ্য গুণগ্রাহীও তিনি।

পাশ্চাত্যের নিকট হ'তে তিনি নিতে রাজী—ভিক্ষুকের মত নয়, কিন্তু মিত্রের মত—ভারতবর্ষ তাদিগকেও কিছু দিতে পারে ব'লে।

তিনি চীন জাপান ভারত-মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতির সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন সম্বন্ধ পুনঃস্থাপনের যথাসাধ্য চেষ্টা কায়মনোবাক্যে করেছেন।

অনেক বৎসর আগে তিনি শান্তিনিকেতনে যে ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম স্থাপন করেন, তাই পরে বিশ্বভারতীতে পরিণত হ'য়েছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন আশ্রমসমূহের আদর্শের ভিত্তির উপর এর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। এখানে শিক্ষালাভ আনন্দে হবে; অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীরা সরল, অনলস, বিলাসিতাবিহীন জীবনযাপন করবেন; অধ্যাপকদের প্রভাব বিদ্যার্থীদের উপর ও বিদ্যার্থীদের প্রভাব অধ্যাপকদের উপর পড়বে; সকল ঋতুতে প্রকৃতির প্রভাব তাঁরা

তাঁর এই দীর্ঘ জীবন মানবজাতির পরম সৌভাগ্যের বিষয়। সত্য বটে, কোন মানুষের জীবন যদি শুধু দীর্ঘই হয়, তা হ'লে শুধু সেই কারণেই তাকে মূল্যবান্ মনে করা যেতে পারে না। যোগবাশিষ্ট গ্রন্থে আছে :—

তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগ পক্ষিণঃ
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি।

"গাছপালাও বেঁচে থাকে, পশুপক্ষী বেঁচে থাকে, কিন্তু তাঁর বেঁচে থাকাই সত্য বেঁচে থাকা যাঁর মন মননের দ্বারা জীবিত।"

মনন ও আনন্দানুভূতি এবং সাহিত্যে ও কাজে তার জীবনব্যাপী প্রকাশ লোকোত্তর বিরাট পুরুষ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের একটি অংশ মাত্র। তাঁর সঙ্গে খুব দীর্ঘকালের পরিচয় সত্ত্বেও তাঁকে ভাল ক'রে চিনেছি বুঝেছি, এ অহংকার আমাদের নেই। যে নিজেই জানে না, সে কেমন ক'রে অন্যকে জ্ঞান দিবে? এই প্রবন্ধে তাঁর নানাবিধ কৃতির সামান্য পরিচয় দেওয়া হচ্ছে বটে; কিন্তু তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব কৃতিগুলির সমষ্টি নয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব সে-সকলের ঊর্দ্ধে অবস্থিত একটি অখণ্ড সত্তা, এই কথা মনে রাখতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ শুধু যে খুব দীর্ঘকাল বেঁচেছিলেন, তা নয়; তিনি তাঁর লোকোত্তর প্রতিভা ও অসাধারণ কর্মশক্তির দ্বারা মানুষকে আনন্দ দিয়েছেন এবং নানা প্রকারে মানুষের কল্যাণ করেছেন। তাঁর অন্য কাজ ছেড়ে দিলেও, তিনি যে ৯ (ন') বৎসর বয়সে শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ অনুবাদ ক'রেছিলেন তা ছেড়ে দিলেও, তিনি লিখেছেনই তো ৬৭/৬৮ বৎসরের অধিক কাল। লিখেছেন আনুমানিক মুদ্রিত বৃহৎ রয়্যাল আটপেজি আকারের ১৭/১৮ হাজার পৃষ্ঠা।

রবীন্দ্রনাথের কবি-পরিচয়ই শ্রেষ্ঠ পরিচয় হ'লেও তিনি কাব্য ছাড়া অন্য রকম পুস্তকও লিখেছেন বিস্তর। তাঁর কবিত্বের উন্মেষ হয় প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে, তাঁর শৈশবে বললেও চলে। পদ্যে তিনি যে-সব কবিতা ও কাব্য-গ্রন্থ লিখেছেন, তা ছাড়া তাঁর গদ্য কবিতা, গদ্য কাব্যও বহুসংখ্যক আছে। তাঁর উপন্যাস, নাটক ও গল্প—সবগুলিই কাব্য।

কাব্য ভিন্ন তিনি ধর্ম, অধ্যাত্মতত্ত্ব, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ, দর্শন, ছন্দ, গ্রন্থসমালোচনা, বিদেশভ্রমণ প্রভৃতি বিষয়ে এত

Farming; philology; history; medicine; astrophysics; geology; bio-chemistry; entomology; cooperative banking, sericulture; indoor decorations; production of hides, manures, sugarcane, and oil; pottery; weaving looms; lacquer work; tractors; village economics; recipes for cooking; lighting; drainage; calligraphy; plant-grafting; meteorology; synthetic dyes; parlour-games; Egyptology; road-making; incubators; wood-blocks; elocution; stall-feeding; jiu-jitsu; printing; ইত্যাদি। তা ছাড়া সাহিত্য বলতে সাধারণতঃ যা বুঝায়, তা ত প'ড়েই থাকেন। ১৯২৬ সালে অক্টোবর মাসে ভিয়েনাতে তিনি যখন পীড়িত ছিলেন, তখন তাঁকে শুয়ে শুয়ে কত বই-ই যে পড়তে দেখেছি, বলতে পারি না।

প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে আমি শান্তিনিকেতনে অনেক সময় থাক্‌তাম। তাঁর বাড়ীর সামনেই একটা বাড়ীতে থাক্‌তাম—মধ্যেখানে ছিল একটা মাঠ। তিনি এমন পরিশ্রমী যে, একদিনও রাত্রে তাঁর লিখবার পড়বার ঘরের আলো আমার শুতে যাবার আগে নিবতে দেখি নি। প্রত্যুষে বেড়াতে গিয়ে দেখেছি, হয় তিনি বারাণ্ডায় উপাসনায় বসেছেন নতুবা উপাসনা সেরে লেখা বা পড়ার কাজে লেগে গেছেন। সেকালে দুপুরে খাবার পরও তাঁকে কখনও শুতে বা হেলান দিতে দেখি নি; গ্রীষ্মে কাউকে তাঁকে পাখার বাতাস দিতে বা তাঁকে নিজে হাত-পাখা চালাতে দেখি নি। তখন শান্তিনিকেতনে বৈদ্যুতিক আলো-পাখা ছিল না। বহু বৎসর পরেও তাঁর শ্রমশীলতায় বিস্মিত হয়েছি। এখন বার্দ্ধক্যে ও ভগ্ন স্বাস্থ্যে তিনি ঠিক তেমনটি নাই, কিন্তু এখনও অনেক যুবকের চেয়ে তিনি বেশী খাটেন। তাঁর অসামান্য মেধার ও প্রতিভার পরিচয়ও এখনও পাওয়া যাচ্ছে।

ঋষিদের যে আধ্যাত্মিক সত্য দৃষ্টির শক্তি ছিল ব'লে আমরা পড়েছি, রবীন্দ্রনাথের তা আছে। তাঁর বহু ধর্ম্মোপদেশে, কবিতায় ও সঙ্গীতে তার পরিচয় আছে। বিলাসী তিনি নন, আবার কৃচ্ছ্রসাধকও নন। জীবনকে তিনি ভালবাসেন। তিনি বলেন,

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

রূপে—এমন কি, বৈজ্ঞানিক ও কবি রূপে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় সেই প্রাচীন ধারা রক্ষিত হয়েছে। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম ভারতীয় দার্শনিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় এবং পরে বিলাতে হিবার্ট লেক্‌চ্যর্স দিতে আহূত হওয়ায় তাঁর দার্শনিকত্ব প্রকাশ্যভাবে স্বীকৃত হয়।

তিনি অনেক মাসিকের সম্পাদকের কাজ ও সাংবাদিকের কাজ দীর্ঘকাল অসামান্য প্রতিভা ও দক্ষতার সহিত করেছিলেন, এবং ভবিষ্যতে-প্রসিদ্ধ অনেক লেখকের লেখা সংশোধন ক'রে তাঁদিকে সাহিত্যিক কৃতিত্ব লাভে সমর্থ করেছিলেন।

তাঁর বহুমুখী প্রতিভার প্রশংসা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

টেনিসন ভিক্টর হিউগোকে বলেছেন,—

"Victor in Drama, Victor in Romance, Cloud-weaver of phantasmal hopes and fears", "Lord of human tears", "Child-lover", "Weird Titan by thy winter weight of years as yet unbroken."

আমরা রবীন্দ্রনাথকে এইসব এবং আরও অনেক বিশেষণে ভূষিত ক'রে সত্য বিজয়শ্রীমণ্ডিত ব'লে অনুভব করতে পারি।

তিনি কোন মহাকাব্য রচনা করেন নাই। মহাকাব্য সাধারণতঃ কোন প্রসিদ্ধ রাজবংশ কোন মহাযুদ্ধ কোন বড় রাজা মহারাজা সম্রাটকে অবলম্বন ক'রে লিখবার রীতি সর্বদেশপ্রচলিত। কিন্তু রাজতন্ত্রের ও রাজা মহারাজা সম্রাটদের যুগ চলে গেছে; যুদ্ধ ঘৃণ্য বিভীষিকা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর অতিকায় জীবজন্তুর যুগ যেমন এখন আর নাই, মহাকাব্যের যুগও তেমনি অতীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা গীতিকবিতাতেই সমধিক ভাস্বর হয়েছে। তিনি ''ক্ষণিকা''য় রহস্য ক'রে লিখেছেন :—

''আমি নাব্‌ব মহাকাব্য
  সংরচনে
  ছিল মনে,—
        ঠেক্‌ল কখন তোমার কাঁকন-
            কিঙ্কিণীতে
        কল্পনাটি গেল ফাটি'
            হাজার গীতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারংবার।"

—রবীন্দ্রনাথ।

"Thy voice is on the rolling air;
I hear thee where the waters run;
Thou standest in the rising sun,
And in the setting thou art fair
What art thou then? I cannot guess;
But though I seem in star and flower
To feel thee some diffusive power,
I do not therefore love thee less
My love involves the love before;
My love is vaster passion now;
Though mix'd with God and Nature thou,
I seem to love thee more and more,
Far off thou art, but ever nigh;
I have thee still, and I rejoice;
I labour, circled with thy voice;
I shall not lose thee though I die."

—Tennyson

১৭৮৩ শকাব্দে, বাংলা সন ১২৬৮ সালে, ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতায় তাঁর জোড়াসাঁকোর পৈত্রিক ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমান ১৮৬৩ শকাব্দে, বাংলা সন ১৩৪৮ সালে ২২শে শ্রাবণ তিনি দেহত্যাগ করেছেন।

এই ত্রিবিধ কৃতিত্বের সমাবেশে এদেশে তাঁকে অদ্বিতীয় সংগীতস্রষ্টা ব'লে মনে করি।

আমরা অনেকেই কেবল নয়নগোচর রূপ দেখি, রবীন্দ্রনাথ অধিকন্তু শ্রবণগোচর রূপও দেখেন। তাঁর গানগুলির দ্বারা তিনি বাংলাদেশকে বহু পরিমাণে গড়েছেন। তাঁর অনেক গানে ভগবদ্ভক্তি ও দেশপ্রীতির অপূর্ব মিশ্রণ দেখা যায়। যেমন নিম্নলিখিত গীতাংশে।

''পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা যুগ-যুগ ধাবিত যাত্রী
হে চির সারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে,
সংকটদুঃখত্রাতা!
জনগণদুঃখ-ত্রায়ক জয় হে, ভারতভাগ্যবিধাতা!

তিনি ছিলেন সুনিপুণ অভিনেতা এবং অভিনয়ের সুদক্ষ শিক্ষক। কবিতার আবৃত্তিতে এবং প্রবন্ধ গল্প নাটক ও উপন্যাসের পঠনে তিনি সুদক্ষ ছিলেন। সাধারণ কথাবার্ত্তায় তিনি সুরসিক ছিলেন। তাঁর সাধারণ কথাবার্ত্তাও ছিল সাহিত্যধর্মী ও সুরসাল। ভাব ও চিন্তার ব্যঞ্জক বহুবিধ সুরুচিপূর্ণ কলাসম্মত মনোজ্ঞ নৃত্যের তিনি স্রষ্টা ও শিক্ষক। দৈহিক সামর্থ্য যত দিন ছিল, নিজেও নৃত্যনিপুণ ছিলেন।

প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে তাঁর প্রতিভার একটা নূতন দিক্ খুলে যায়। তা চিত্রাঙ্কন। তাঁর চিত্র পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য কোন শ্রেণীতে পড়ে না, কারো কাছে শেখা নয়। এ তাঁর নিজস্ব। তাঁর চিত্রাবলী সাধারণতঃ কোন গল্প বলে না ব'লে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ও উপভোগ্য না-হ'লেও বিদেশে ও এদেশে সমঝদারেরা এর অসাধারণ গুণ মানেন।

বঙ্গের আধুনিক চিত্রকলার উৎপত্তি যে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রাণনা থেকে, সে সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''বাংলার কবি (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ) আর্টের সূত্রপাত কল্লেন, বাংলার আর্টিষ্ট (অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথ) সেই সূত্র ধরে একলা একলা কাজ করে চল্লো কত দিন।"

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্যে তিনি যা করেছেন, অন্য কোন লেখক তা করেন নি। তাঁর লেখায় বাংলা সাহিত্য প্রাদেশিকতা ও দেশিকতা অতিক্রম

প্রবন্ধাদি লিখেছেন ও বক্তৃতা ক'রেছেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে সেগুলির নাম করাও সোজা নয়। তাছাড়া, তাঁর পত্রাবলী আছে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-কৌতুক-পরিহাসাত্মক লেখা আছে, হেঁয়ালী নাট্য আছে, গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য আছে, "পঞ্চভূতের ডায়ারী" নামক পুস্তক আছে যাকে কোন শ্রেণীতে ফেলা সুকঠিন। তিনি যেমন প্রাপ্তবয়স্কদের, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের, জন্যে লিখেছেন, তেমনি ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যেও গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ছড়া—এমন কি বর্ণপরিচয়ের বহিও লিখেছেন। বাস্তবিক, বই লিখে, গল্প ব'লে, গান বেঁধে, গান গেয়ে, ছবি এঁকে, অভিনয় ক'রে এবং আরও নানা রকমে ছোট ছেলেমেয়েদিগকে আনন্দ তিনি যত দিয়ে গেছেন, এবং ভবিষ্যতেও দেবার উপায় ক'রে রেখে গেছেন, এমন আর কেউ নয়। শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যই তো তাদিগকে আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া। এই বিদ্যালয়ের প্রথম অবস্থায় তিনি তাদের জন্যে কত নূতন খেলার সৃষ্টি ক'রে তাদের খেলার সঙ্গী হয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিকদের তাঁরই কাছে তাঁরই বিরুদ্ধে একটি নালিশ ছিল, যে, তিনি বৈজ্ঞানিক কিছু লেখেন নি। চার বৎসর পূর্বে "বিশ্বপরিচয়" লিখে তিনি তাঁদের সে ক্ষোভ দূর ক'রে গেছেন। এসব ছাড়া তাঁর নিজের লেখা ইংরেজী বইও অনেকগুলি আছে যেগুলি তাঁর বাংলা বইয়ের অনুবাদ নয়। তাঁর বাংলা অনেক বইয়ের অনুবাদ পৃথিবীর পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য যত অধিক ভাষায় হয়েছে, ভারতবর্ষের আর কোন লেখকের তা ত হয়ই নাই, অন্য কোন দেশেরও আধুনিক কোনও লেখকের হয়েছে ব'লে আমি জানি না। তাঁর কোন কোন বইয়ের জার্ম্যান অনুবাদ এত বেশী বিক্রী হয়েছিল যে, মার্কের দর বিষম প'ড়ে না গেলে তিনি বহু বহু লক্ষ টাকা প্রকাশকদের কাছ থেকে পেতে পারতেন এবং বিশ্বভারতীর জন্যে তাঁকে কোন উদ্বেগ সহ্য করতে হ'ত না।

ইয়োরোপের অনেক বিখ্যাত লোকের লেখা পত্রাবলী আছে। আমরা যতটা জানি, তাঁদের কারোও পত্রাবলী সাহিত্যিক উৎকর্ষে এবং বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীকে অতিক্রম করে নাই। তাঁর লেখা একখানা পোষ্টকার্ডও সাহিত্যরসাপ্লুত।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে কবি ও দার্শনিক দুই পৃথক্ শ্রেণীর মানুষ ব'লে পরিগণিত হয়। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে একই মানুষকে কবি ও দার্শনিক

চতুর্থ প্রজা। বাবা, একথা রাজা শুন্‌বে না।

ধনঞ্জয়। তবু শোনাতে হবে। রাজা হয়েছে বলেই কি সে এমন হতভাগা যে ভগবান তাকে সত্য কথা শুনতে দেবেন না। ওরে, জোর করে শুনিয়ে আসব।

পঞ্চম প্রজা। ও ঠাকুর, তাঁর জোর যে আমাদের চেয়ে বেশি—তাঁরই জিত হবে।

ধনঞ্জয়। দূর বাঁদর, এই বুঝি তোদের বুদ্ধি! যে হারে তার বুঝি জোর নেই! তার জোর যে একেবারে বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত পৌঁছয় তা জানিস্!

ষষ্ঠ প্রজা। কিন্তু ঠাকুর, আমরা দূরে ছিলুম, লুকিয়ে বাঁচতুম—একেবারে রাজার দরজায় গিয়ে পড়ব, শেষে দায়ে ঠেক্‌লে আর পালাবার পথ থাকবে না।

ধনঞ্জয়। দেখ পাঁচকড়ি, অমন চাপাচুপি দিয়ে রাখলে ভাল হয় না। যতদূর পর্যন্ত হবার তা হতে দে, নইলে কিছুই শেষ হতে চায় না। যখন চূড়ান্ত হয়, তখনি শান্তি হয়।

আর এক অঙ্কের আর একটি দৃশ্য থেকে কিছু উদ্ধৃত করি।

প্রতাপাদিত্য। দেখ বৈরাগী, তুমি অমন পাগ্‌লামি ক'রে আমাকে ভোলাতে পারবে না। এখন কাজের কথা হোক্। মাধবপুরের প্রায় দু-বছরের খাজনা বাকি—দেবে কি না বল।

ধনঞ্জয়। না মহারাজ, দেব না।

প্রতাপ। দেবে না! এত বড় আস্পর্দ্ধা!

ধনঞ্জয়। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

প্রতাপ। আমার নয়!

ধনঞ্জয়। আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কি ব'লে।

প্রতাপ। তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে।

ধনঞ্জয়। হাঁ মহারাজ, আমিই ত বারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা ত বোঝে না—পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়। আমিই বলি, আরে আরে এমন কাজ করতে নেই—প্রাণ দিবি তাঁকে প্রাণ দিয়েছেন যিনি—তোদের রাজাকে প্রাণহত্যার অপরাধী করিস্ নে।

ধনঞ্জয় বৈরাগী যখন বললেন তিনিই প্রজাদিগকে খাজনা দিতে বারণ করেছেন, তখন প্রতাপাদিত্য ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "দেখ ধনঞ্জয়, তোমার কপালে দুঃখ আছে।" ধনঞ্জয় যথাযোগ্য উত্তর দেবার পর—

মহাকাব্য সেই অভাব্য
  দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
  কণায় কণায়।
    আমি নাব্‌ব মহাকাব্য
      সংরচনে
      ছিল মনে।
হায় রে কোথা যুদ্ধকথা
    হৈল গত
      স্বপ্ন মত।
পুরাণ-চিত্র বীর-চরিত্র
    অষ্ট সর্গ,
কৈল খণ্ড তোমার চণ্ড
    নয়ন খড়্গ।
রৈল মাত্র দিবারাত্র
    প্রেমের প্রলাপ,
দিলেম ফেলে ভাবী কেলে
    কীর্তি কলাপ।
হায় রে কোথা যুদ্ধকথা
    হৈল গত
      স্বপ্ন মত।

তাঁর গান ও গীতরচনা তাঁর প্রতিভা ও শক্তির আর একটি দিক্। ধর্ম, দেশভক্তি, প্রেম, প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি দু-হাজার বা আরও বেশী বহু ও বিচিত্রভাবোদ্দীপক গান বেঁধেছেন ও তাতে সুর দিয়েছেন। ছয় শত গানের রচয়িতা শুবার্টকে পাশ্চাত্য মহাদেশের লোকেরা পৃথিবীর সবচেয়ে অধিক গানের রচয়িতা মনে করে। রবীন্দ্রনাথ তার প্রায় চারগুণ গান বেঁধেছেন। বয়সকালে তাঁর গলাও ছিল চিত্তহারী, চমৎকার ও বিস্ময়কর। তিনি চলতি অর্থে ওস্তাদ নন—যদিও ওস্তাদী গানের শিক্ষা তাঁর হয়েছিল ও ওস্তাদী তিনি বুঝেন। গানের কথা সৃষ্টি, সুর সৃষ্টি এবং কণ্ঠে কথা ও সুরের সাহায্যে বহু বিচিত্র ধ্বনিরূপের সৃষ্টি—

''অস্পৃশ্যতা''র বিরুদ্ধে আন্দোলন ব্রাহ্মসমাজের জাতিভেদ বিরোধী আন্দোলনের অন্তর্গত। এই প্রেরণা স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে ত্রিশ বৎসর পূর্বে রচিত ''গীতাঞ্জলি''র অন্তর্গত সেই কবিতায় যার গোড়ায় আছে,

> ''হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
> অপমানে হোতে হবে তাহাদের সবার সমান।
> মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
> সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান
> অপমানে হোতে হবে তাহাদের সবার সমান।''

''গীতাঞ্জলি''র ইংরেজী অনুবাদ দ্বারাই তিনি বিশ্ব-সাহিত্যিকবাঞ্ছিত নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। এত বড় ইংরেজী লেখক তিনি ছিলেন এবং ইংরেজী লেখার জন্যে ১৭/১৮ বৎসর বয়সেই বিখ্যাত অধ্যাপক হেনরি মর্লির ছাত্র হিসাবে তাঁর প্রশংসা পেয়েছিলেন; কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত নিজের ইংরেজী লেখার ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। কী অলোকসামান্য নম্রতা!

দীনদরিদ্র নিরক্ষর লোকদের প্রতি তাঁর প্রীতি শ্রদ্ধা সমবেদনা করুণা যে তাঁর কত রচনাতে আছে, তা সংক্ষেপে উল্লেখ করাও কঠিন। ঐ ''গীতাঞ্জলি''তেই আছে,

> ''যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
> সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
> সবার পিছে, সবার নীচে,
> সব হারাদের মাঝে।''

আরও আছে,

> ''তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
> করছে চাষা চাষ
> পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
> খাটছে বারো মাস।''

গত ফাল্গুনের ''প্রবাসী''তে প্রকাশিত তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ''ঐকতান'' কবিতাতে আছে :—

ক'রে সমগ্র বিশ্বের দরবারে পৌঁছেছে। তার মধ্যে সমগ্রজাগতিক ভাব ও চিন্তার ধারা খেলছে, অথচ যা একান্ত বঙ্গের ও ভারতের, তাও তাতে আছে।

যদি কোন বিদেশী কেবল তাঁর লেখা পড়বার জন্যেই বাংলা শেখেন, তা হ'লেও তাঁর শ্রম সার্থক হবে।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পর স্বদেশী আন্দোলনে তিনি রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে কর্ম্মী রূপে নেমেছিলেন। যখন সন্ত্রাসনবাদ মূর্ত্ত হ'ল, তখন তিনি তার প্রকাশ্য প্রতিবাদ ক'রলেন। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে কর্ম্মী তিনি বেশীদিন থাকেন নাই, কিন্তু তাতে বরাবর অন্যতম চিন্তানায়ক ছিলেন—এ বৎসরও মৃত্যুর কিছুদিন আগেও ছিলেন। জালিয়ানওয়ালা-বাগের কাণ্ডের প্রতিবাদ তিনিই প্রথমে করেন এবং তার কার্য্যতঃ প্রতিবাদস্বরূপ নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। যে-সব সভায় তাঁর অধিনায়কত্বের প্রয়োজন হয়েছে, তাতে অল্প দিন আগেও তিনি সভাপতি হয়েছেন। সম্প্রতিও তাঁর বাণী, উপলক্ষ্য ঘটলেই, সকল দেশভক্তকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছে।

রাষ্ট্রকে অবস্থাবিশেষে কর দেওয়া বা না-দেওয়ার প্রজাদের অধিকার এবং স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব ও বন্ধন বরণ এবং তার গৌরব ও আনন্দ, তিনি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকে প্রথম এবং পরে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে "পরিত্রাণ" নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর মুখে ব্যক্ত করেন। "মুক্তধারা" নাটকেও ধনঞ্জয় বৈরাগী এইরকম কথা বলেছেন।

তাঁর "প্রায়শ্চিত্ত" নাটক তাঁর "বৌ ঠাকুরাণীর হাট" নামক আরও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত উপন্যাসের গল্প অবলম্বন ক'রে লিখিত। এই নাটকটির বিজ্ঞাপনের তারিখ ৩১শে বৈশাখ, সন ১৩১৬ সাল।

"প্রায়শ্চিত্ত" নাটক থেকে কিছু উদ্ধৃত কচ্ছি।

পথপার্শ্বে ধনঞ্জয় বৈরাগী ও মাধবপুরের এক দল প্রজা।

তৃতীয় প্রজা। বাবা, আমরা রাজাকে গিয়ে কী বল্‌ব?

ধনঞ্জয়। বল্‌ব, আমরা খাজনা দেব না।

তৃতীয় প্রজা। যদি শুধোয়, কেন দিবি নে?

ধনঞ্জয়। বল্‌ব, ঘরের ছেলেমেয়েকে কাঁদিয়ে যদি তোমাকে টাকা দিই তা হ'লে আমাদের ঠাকুর কষ্ট পাবে। যে অন্নে প্রাণ বাঁচে, সেই অন্নে ঠাকুরের ভোগ হয়; তিনি যে প্রাণের ঠাকুর। তার বেশি যখন ঘরে থাকে তখন তোমাকে দিই—কিন্তু ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে খাজনা দিতে পারব না।

কৃষি, পল্লীস্বাস্থ্য, পল্লীশিল্প, গ্রামে দরকারমত কৃষকদের মূলধন সরবরাহ, ইত্যাদি কাজ এই বিভাগ ক'রে থাকেন।

তিনি অসহযোগ আন্দোলনের, এবং ছাত্রদের স্কুল-কলেজ বর্জনের সমর্থন কখনও করেন নি।

আন্তর্জাতিকতা নামে অভিহিত তাঁর বিশ্বমানবপ্রেমের আভাস তাঁর অনেক আগের রচনাতেও পাওয়া যায়, কিন্তু স্পষ্ট পাওয়া যায় ‘‘প্রবাসী’’র প্রথম সংখ্যার জন্যে প্রায় এক চল্লিশ বৎসর আগে লিখিত সেই কবিতায় যার গোড়ায় আছে,

‘‘সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।’’

তিনি তাঁহার ‘‘ন্যাশন্যালিজ্‌ম্‌’’ নামক ইংরেজী গ্রন্থে সেই স্বাজাতিকতাই গর্হিত বলেছেন যা বিদেশ ও বিজাতির ধন গ্রাস করতে ও তাদের উপর প্রভুত্ব করতে চায়। সব সাম্রাজ্যবাদ এর অন্তর্গত এবং নাৎসিবাদ সর্বাধম সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত। পরদেশদ্রোহিতা না-ক'রে যে স্বাজাতিকতা স্বদেশের কল্যাণ করতে চায়, কথায়, কাব্যে, বক্তৃতায়, গানে ও কাজে চিরদিনই তিনি তার সমর্থক ও অন্যতম প্রধান অনুপ্রাণক। তাই তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে ‘‘নৈবেদ্য’’ গ্রন্থে প্রার্থনা করতে পেরেছিলেন,

‘‘চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি

প্রতাপ। দেখ বৈরাগী তোমার চাল নেই চুলো নেই—কিন্তু এরা সব গৃহস্থ মানুষ, এদের কেন বিপদে ফেলতে চাচ্চ? (প্রজাদের প্রতি) দেখ বেটারা, আমি বলছি তোরা সব মাধবপুরে ফিরে যা। বৈরাগী, তুমি এইখানেই রইলে। (ধনঞ্জয় বন্দী হইলেন)

আগুন লেগে কারাগার ভস্মসাৎ হওয়ায় ধনঞ্জয় বৈরাগী বাইরে এসেছেন।

ধনঞ্জয়। জয় হোক্ মহারাজ! আপনি ত আমাকে ছাড়তেই চান না; কিন্তু কোথা থেকে আগুন ছুটীর পরোয়ানা নিয়ে হাজির। কিন্তু না বলে যাই কি ক'রে? তাই হুকুম নিতে এলুম।

প্রতাপ। ক'দিন কাট্‌ল কেমন?

ধনঞ্জয়। সুখে কেটেছে—কোন ভাবনা ছিল না। এ সব তার লুকোচুরি খেলা —ভেবেছিল গারদে লুকবে, ধরতে পারব না—কিন্তু ধরেছি, চেপে ধরেছি, তারপর খুব হাসি, খুব গান। বড় আনন্দে গেছে—আমার গারদ ভাইকে মনে থাকবে!

(গান)

(ওরে) শিকল, তোমায় কোলে করে
দিয়েছি ঝঙ্কার।
(তুমি) আনন্দে ভাই রেখেছিলে ভেঙে অহঙ্কার।
তোমায় নিয়ে ক'রে খেলা
সুখে দুঃখে কাটল বেলা,
অঙ্গ বেড়ি' দিলে বেড়ি
বিনা দামের অলঙ্কার!
তোমার পরে করি নে রোষ,
দোষ থাকে ত আমারি দোষ,
ভয় যদি রয় আপন মনে
তোমায় দেখি ভয়ঙ্কর।
অন্ধকারে সারা রাতি
ছিলে আমার সাথের সাথী,
সেই দয়াটি স্মরি তোমায়
করি নমস্কার।

প্রতাপ। বল কি বৈরাগী, গারদে তোমার এত আনন্দ কিসের?

ধনঞ্জয়। মহারাজ, রাজ্যে তোমার যেমন আনন্দ, তেমনি আনন্দ, অভাব কিসের? তোমায় সুখ দিতে পারেন, আর আমাকে সুখ দিতে পারেন না?

পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র-লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে, অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষে করব। আশা করব, মহা প্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম ব'লে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এই কথা আজ ব'লে যাব প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারি প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে,

'অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।।'

তিনি ছিলেন সমুদয় বিদেশীবিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে। তাঁর এই উদার ভাব তাঁর নানা রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। তার মধ্যে তাঁর "ভারত-তীর্থ" নামক কবিতাটি সুবিদিত। তার দুটি কলি উদ্ধৃত ক'রব।

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হোল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন—
শক হুণ-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হোলো লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার,

"চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি ব'সে তাঁত বোনে জেলে ফেলে জাল,
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার,
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।"

সাধারণ লোকেদের সম্বন্ধে তাঁর এইরকম নানা কথা শুধু পুঁথিগত নয়। "অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ" ইত্যাদি লম্বা চওড়া রব দেশে উঠবার অনেক আগে থেকেই তাঁর পরিবারে ও শান্তিনিকেতন "অস্পৃশ্য" পাচক ও অন্যান্য ভৃত্য বরাবর নিযুক্ত হয়ে আসছে অবাধে।

যে-সকল নারীকে সমাজ পতিতা বলে (কিন্তু দুশ্চরিত্র পুরুষকে পতিত বলে না) তাদের প্রতি কবির করুণার অন্ত নাই। তার পরিচয় তাঁর "চতুরঙ্গ" গ্রন্থের ননীবালার কাহিনীতে পাই, আর পাই "কাহিনী" গ্রন্থের 'পতিতা' কবিতায় এবং "চৈতালী"র 'করুণা' ও 'সতী' কবিতা দুটিতে। আরও দৃষ্টান্ত আছে।

রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য ও পরিচালনা নিরপেক্ষ ভাবে দেশের—বিশেষ ক'রে পল্লীর, হিতকর কাজ করবার প্রয়োজন ও পদ্ধতি তিনি অসহযোগ আন্দোলনের বহু পূর্বে নির্দেশ ক'রে নিজের জমিদারীতে ও সুরুলে তদনুসারে কাজ করিয়ে এসেছিলেন। সরকারী রিপোর্টে পর্যন্ত তাঁর জমিদারী ব্যবস্থার প্রশংসা বেরিয়েছিল। তিনি রেয়ৎ প্রজাদের খুব প্রিয় ছিলেন। তার একটা সত্যি গল্প বলি। একবার এক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর সঙ্গে তাঁর জমিদারী দেখতে যান। তাঁর যে প্রজার উপরে তাঁদের যানবাহনের ব্যবস্থা করবার ভার ছিল, সে একখানি মাত্র পাল্কি এনে হাজির করে! তার ধারণা তাদের রাজার সঙ্গে যে যাবে সে হেঁটে যাবে, হোক্ না কেন সে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট! রবীন্দ্রনাথ অনেক বলা-কওয়ায় সেই প্রজা সাহেবের জন্য শেষ পর্যন্ত একটা বেতো ঘোড়া এনেছিল!

পাবনার যে প্রসিদ্ধ প্রাদেশিক কন্ফারেন্সে তিনি সভাপতির কাজ করেন এবং বাংলা ভাষায় সভাপতির অভিভাষণ রচনা ও পাঠের প্রথম দৃষ্টান্ত দেখান, তাতে তাঁর কর্মপদ্ধতি তিনি সভার সম্মুখে উপস্থিত করেন। তারপরও তাঁর অনেক বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে তিনি এই সব কথা বলেছেন। বিশ্বভারতীর একটি প্রধান বিভাগ শ্রীনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত গ্রামোন্নয়ন বিভাগ।

ও অসীমের চরণে মাথা নত ক'রে; এখানকার শিক্ষা শুধু পণ্ডিত প্রস্তুত করবে না, আত্মনির্ভরশীল উপার্জ্জকও প্রস্তুত করবে; শুধু জ্ঞানের চর্চ্চা এখানে হবে না, সঙ্গীত-চিত্রকলা-আদি সুকুমার কলার অনুশীলনও হবে; আবার বস্ত্রবয়ন-আদি নানাবিধ কারুশিল্প ও কৃষি শিক্ষা দেওয়া হবে এবং গ্রামগুলিকে স্বাস্থ্যে সচ্ছলতায় সৌন্দর্যে আবার আনন্দের নিলয় করবার চেষ্টা হবে; অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীরা কেবল জ্ঞাতা ও জিজ্ঞাসু হবেন না, কর্ম্মী ও স্রষ্টাও হবেন; বিদ্যার্থীরা ব্যষ্টি-ও-সমষ্টিগত ভাবে যথাসম্ভব স্বশাসক হবেন;— সংক্ষেপে বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য এইরূপ।

এখানে ছাত্রছাত্রীরা পৃথক্ পৃথক্ আবাসে থেকে শিক্ষালাভ করেন একত্র। ভারতবর্ষের সকল প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ের সংস্কৃতির অনুশীলন এখানে হয়, চীন তিব্বত প্রভৃতি বিদেশের সংস্কৃতির অনুশীলনও হ'য়ে থাকে। এখানে ছাত্রছাত্রীদের নানা রকম ব্যায়াম ও খেলার ব্যবস্থা আছে, গ্রামসেবার সুযোগ আছে।

১৯২৪ সালে বিশ্বভারতীর অন্যতম অঙ্গ রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষাসত্র" নামক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ইহার একটি প্রধান মন্ত্র—

> প্রথম হইতেই শিশু কারুশিল্পে ও গৃহশিল্পে শিক্ষানবীশ রূপে শিক্ষাসত্রে প্রবেশ করিবে। শিল্পশালায় সে শিক্ষিত-উৎপাদক ও সম্ভাব্য-স্রষ্টারূপে দক্ষতা অর্জন এবং নিজের হাত দুটির স্বাধীনতা লাভ করিবে; আবার, যে বাসগৃহ ও তাহার আসবাব প্রস্তুত করিতে ও তাহার ঘরকন্না চালাইতে সে সাহায্য করিবে, তাহার অধিবাসীরূপে সে চিত্তের প্রসার এবং শিক্ষাসত্ররূপ ক্ষুদ্র পুরীর পৌরজনের অধিকারও সে অর্জন করিবে। (অনুবাদ)

বিশ্বভারতীর ৯-সংখ্যক বুলেটিনে শিক্ষাসত্রের সমুদয় বৃত্তান্ত আছে। তাতে দেখা যায়, গৃহকর্ম্ম ও নানাবিধ শিল্পের ভিতর দিয়ে বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয় শিখাবার ব্যবস্থা আছে। ছোট শিশুদিগকে ও অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেমেয়েদিগকে কি কি শিল্প শিখান যেতে পারে, তার তালিকা আছে। সুতা কাটা, কাপড় বোনা, ছুতোরের কাজ, প্রভৃতি তার অন্তর্গত। লেখাপড়া শিখাবার ব্যবস্থাও অবশ্য আছে। যাঁরা শিক্ষাসত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জানতে চান, তাঁরা বিশ্বভারতী বুলেটিনের ৯ ও ২১ সংখ্যা দেখবেন।

বিশ্বভারতীর বুলেটিন দুটিতে, শিক্ষাসত্র স্থাপন কেন করা হয়েছে, তা, এবং এর মূলগত শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপ্রণালী যা লিখিত হ'য়েছে, তাতে

বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করে নি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।"

তিনি ভারতকে সেই স্বর্গে জাগরিত দেখার আনন্দ সম্ভোগ ক'রে যেতে পান নাই, একথা আমরা যেন কখনও না ভুলি।

বাহ্য রাষ্ট্রনৈতিক বন্ধন হ'তে মুক্তি তাঁর স্বাধীনতার আদর্শের নিশ্চয়ই অন্তর্গত; কিন্তু সামাজিক ও আন্তরিক সর্ববিধ দাসত্ব হ'তে মুক্তি এর অস্থিমজ্জা। দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা তিনি সর্বান্তঃকরণে চাইতেন।

ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের যে যে ব্যবহার নিন্দনীয় তিনি তার তীব্র নিন্দা করেছেন, কিন্তু ইংলণ্ডের ও ইংরেজ জাতির গুণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

সেইরূপ পাশ্চাত্য দেশসমূহের এবং তাদের রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির নিন্দনীয় দিক্‌গুলির নিন্দা তিনি করেছেন, কিন্তু তাদের বিজ্ঞানের ও জিজ্ঞাসুতার, জনসেবার ও সংস্কৃতির এবং মনুষ্যত্বকে সম্মানদানের যথাযোগ্য গুণগ্রাহীও তিনি ছিলেন।

পাশ্চাত্যের নিকট হ'তে তিনি নিতে রাজী—ভিক্ষুকের মত নয়, কিন্তু মিত্রের মত—ভারতবর্ষ তাদিগকেও কিছু দিতে পারে ব'লে।

পাশ্চাত্য 'সভ্যতা' সম্বন্ধে তাঁর শেষ উক্তি গত ১লা বৈশাখের অভিভাষণ "সভ্যতার সংকট" সাতিশয় বেদনাপূর্ণ; কিন্তু তিনি তাতেও মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্যের কথা বলেন নাই। তাতে বলেছেন :—

> ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে! একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি

lotus throne, the goddess of Learning and also of Music, with the Golden Lyre—the *Veena*—on her lap. In both countries, the arcanca of light have fallen on divinity of human achievements. And that is Wisdom.

দৈহিক আত্মরক্ষা বিষয়ে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা এবং পরোক্ষ ভাবে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্করাও যাতে অন্য যে-কোন দেশের লোকদের সমকক্ষ হয়, রবীন্দ্রনাথের সে দিকে দৃষ্টি ছিল। তিনি স্বয়ং ছেলেবেলা ও কৈশোরে বাড়ীর পালোয়ানদের সঙ্গে কুস্তি করতেন। বিশ্বভারতীতে ছেলেমেয়েদের জাপানী জিউজিৎসু শেখাবার জন্যে তিনি জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন জিউজিৎসু-ওস্তাদ আনিয়েছিলেন। তাঁর কাছে অনেক ছেলেমেয়ে বেশ জিউজিৎসু শিখেছিল। অধ্যাপকেরাও ২/১ জন, যেমন স্বর্গগত গৌরগোপাল ঘোষ, বেশ শিখেছিলেন। আমরা কবিকে দুঃখ করতে শুনেছি যে, বিশ্বভারতীর বাইরে স্বদেশবাসীরা এত বড় জাপানী জিউজিৎসুবিদের কাছে আত্মরক্ষার নানা কৌশল শিখতে আগ্রহ দেখান নাই।

লাঠি খেলা, ছোরা থেকে আত্মরক্ষা, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদির কৌশল কবির সামনে ছাত্রছাত্রীদিগকে দেখাতে আমরা দেখেছি। শান্তিনিকেতনই তাদের এ সকলের শিক্ষার স্থান। বিশ্বভারতীর কোন কোন ছাত্রকে সার্কাসের শক্ত শক্ত ব্যায়াম ও দুঃসাহসের কাজ করতে আমরা দেখেছি। শান্তিনিকেতনের ফুটবল খেলোয়াড়রা মফঃস্বলের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের অন্যতম। শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক খেলাধুলার মধ্যে নানারকম দৌড় এবং তীর দিয়ে লক্ষ্যভেদের প্রতিযোগিতা হ'য়ে থাকে।

আগে আগে কবি শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের থাকবার ঘরে তাদিগকে গল্প বলতেন; তাছাড়া কিছু দূরের খোলা মাঠে বা স্বাভাবিক কোন কুঞ্জেও বলতেন। সেখান থেকে ফিরবার সময় ছেলেরা কখনও কখনও তাঁকে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় আহ্বান করত। এ ৩০/৩৫ বৎসর আগেকার কথা। দৌড়ে তিনিই সব বারেই জিততেন। তিনি তখন বলিষ্ঠ, কর্মিষ্ঠ পুরুষ; বোলপুর স্টেশন থেকে হেঁটে শান্তিনিকেতন যাতায়াত করতেন।

ছাত্রদের মধ্যে স্বশাসন তিনি প্রবর্তিত করেন। তাদের নিজেদের নায়ক ও অধিনায়ক এবং তাদের দোষত্রুটির বিচারের জন্যে তাদেরই দ্বারা তাদেরই মধ্য থেকে বিচারক নির্বাচন প্রথা তিনি প্রবর্তিত করেন। ছাত্রছাত্রীদের

দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে,
যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে।

*　　*　　*

এসো হে আর্য, এসো অনার্য,
হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খ্রীষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি' মন
ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, হোক অপনীত
সব অপমান-ভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা।
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র-করা
তীর্থ নীরে।
আজি ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে।

তিনি চীন জাপান জাভা বালী ও ভারত মহাসাগরের অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতির সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ পুনঃস্থাপনের যথাসাধ্য চেষ্টা কায়মনোবাক্যে ক'রে গেছেন।

অনেক বৎসর আগে তিনি শান্তিনিকেতনে যে ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম স্থাপন করেন, তাই পরে বিশ্বভারতীতে পরিণত হ'য়েছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন আশ্রমসমূহের আদর্শের ভিত্তির উপর এর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। এখানে শিক্ষালাভ আনন্দে হবে; অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীরা সরল, অনলস, বিলাসিতাবিহীন জীবনযাপন করবেন; অধ্যাপকদের প্রভাব বিদ্যার্থীদের উপর ও বিদ্যার্থীদের প্রভাব অধ্যাপকদের উপর পড়বে; সকল ঋতুতে প্রকৃতির প্রভাব তাঁরা অনুভব করবেন; ভারতের ও অন্য সকল দেশের জ্ঞানের ও ভাবের নানা প্রবাহ এখানে অবাধে প্রবাহিত হবে; সকলে শ্রদ্ধাবান্ ও শুচি থাক্‌বেন এক

কবি দ্বাদশ বার পৃথিবীর নানা দেশে বেড়িয়ে ভারতের লোকদের সহিত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকদের যোগ স্থাপন ও বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। তিনি ছিলেন পৃথিবীর জাতিসমূহের অন্যতম আন্তর বন্ধনরজ্জু এবং উদ্যোগী জগৎশান্তিকামী।

তাঁকে সবাই কবি ব'লেই জানে; তিনি যে কিরূপ পণ্ডিত, কত রকমের কত বই তিনি পড়েছিলেন, তা লোকে জানে না। তাঁর কবিত্ব খ্যাতি না থাক্‌লে পাণ্ডিত্য খ্যাতি র'ত্‌ত। বাংলা ও সংস্কৃত ছাড়া কত বিষয়ের বই তিনি শুধু ইংরেজীতেই পড়েছিলেন, ইংরেজীতে তার একটা ফর্দ দিচ্ছি।

> Farming; philology; history; medicine; astrophysics; geology; bio-chemistry; entomology; co-operative banking, sericulture; indoor decorations; production of hides, manures, sugarcane, and oil; pottery; weaving looms; lacquer work; tractors; village economics; recipes for cooking; lighting; drainage; calligraphy; plant-grafting; meteorology; synthetic dyes; parlour-games; Egyptology; road-making; incubators; wood-blocks; elocution; stall-feeding; jiu-jitsu; printing; etc.

এ সকল ছাড়া সাহিত্য বলতে সাধারণতঃ যা বুঝায়, তা ত পড়তেনই। ১৯২৬ সালে অক্টোবর মাসে ভিয়েনাতে তিনি যখন পীড়িত ছিলেন, তখন তাঁকে শুয়ে শুয়ে কত বই-ই যে পড়তে দেখেছিলাম, বলতে পারি না।

উপরে তাঁর অধীত নানা বিষয়ের যে ইংরেজী তালিকা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে চিকিৎসা-বিদ্যা একটি। হোমিওপ্যাথির বড় বড় বই তিনি দস্তুরমত অধ্যয়ন করেছিলেন, বায়োকেমিক্যাল চিকিৎসাও ভাল জানতেন। চিকিৎসা করতেনও ভাল। কখনও কখনও রহস্য ক'রে বল্‌তেন "আমি ফী নিই না ব'লে আমার প্রশংসা বা পসার হয় নি।"

ইংরেজী ফর্দটির মধ্যে রান্নার পাঁতি ও "সুন্দর হস্তাক্ষর" (calligraphy) -এর উল্লেখ আছে। তিনি নানারকম রান্নার পরীক্ষা করতেন। নানা খাদ্যের গুণাগুণ পরীক্ষাও করতেন। একসময়ে নিমপাতা তাঁর একটি প্রধান খাদ্য ছিল। চিনির চেয়ে গুড় তিনি বরাবর ভালবাসতেন। ভাতের ফেন ফেলে দেওয়ার নিন্দা করতেন। একসময় রেড়ির তেলের ময়েন দেওয়া রুটি

শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং শিশুস্বভাব, বালস্বভাব ও মানব-মন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় আছে। তা সত্ত্বেও এইরূপ প্রতিষ্ঠান দেশের লোকদের ও নেতাদের দৃষ্টি কেন আকর্ষণ করে নাই, কেন এর আদর্শ বহু স্থানে অনুসৃত হয় নাই, তা চিন্তনীয়। এ বিষয়ে আমাদের একটা অনুমান লিখছি।

এর পশ্চাতে কোন রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও আন্দোলন এবং বড় কোন রাজনীতিকের নামের প্রভাব নাই;—এতে বলা হয় নাই, যে, শিক্ষাসত্রের অনুযায়ী শিক্ষা দিলে পূর্ণস্বরাজ পাওয়া যাবে ও দেশ স্বাধীন হবে। মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পিত ওআর্ধা স্কীমের উক্ত সুবিধাগুলি আছে—যেমন তাঁর চরখা ও খাদি প্রচারের সমর্থক অর্থনৈতিক যুক্তির সঙ্গে চরখা ও খাদি দ্বারা দেশ স্বাধীন হবে, এই রাজনৈতিক উক্তিও আছে!

বিশ্বভারতীতে ছাত্র ও ছাত্রীরা কেন গীতবাদ্য, নৃত্য ও অভিনয় করে এবং সেখানে এইগুলি শিখাবার ব্যবস্থা কেন করা হয়েছে, সে-বিষয়ে অনেকের স্পষ্ট ধারণা নাই। এ বিষয়ে কবি চীনদেশের অন্যতম প্রধান নেতা মহামান্য তাই চি তাও মহাশয়কে একটি পত্রে লিখেছিলেন :—

> Tonight we shall present before you another aspect of our ideal where we seek to express our inner self through song and dance. Wisdom, you will agree, is the pursuit of completeness; it is in blending life's diverse work with the joy of living. We must never allow our enjoyment to gather wrong associations by detachment from educational life; in Santiniketan, therefore, we provide our own entertainment, and we consider it a part of education to collaborate in perfecting beauty. We believe in the discipline of a regulated existence to make our entertainment richly creative.
>
> In this we are following the ancient wisdom of China and India; the *Tau*, or the True Path, was the golden road uniting arduous service with music and merriment. Thus in the hardest hours of trial you have never lost the dower of spiritual gaiety which has refreshed your manhood and attended upon your great flowerings of civilisation. Song and laughter and dance have marched along with rare loveliness of Art for centuries of China's history. In India Sarasvati sits on her

ইহলোক ও পরলোক বিশ্বজননীর দুই স্তন। মৃত্যুরূপ হাত দিয়ে তিনি মানুষকে ইহলোক-রূপ এক স্তনের পীযূষের পর পরলোক-রূপ অন্য স্তনের পীযূষ পান করান।

কবিকে আমি সাধক ব'লে জানতাম। কিন্তু বৈরাগ্য তাঁর সাধনার পথ ছিল না। তিনি লিখেছেন :—

"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারংবার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে।
ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ কর যোগাসন, সে নহে আমার।
যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ র'বে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তি রূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তি রূপে রহিবে ফলিয়া।"

কবি নারীকুলের—বিশেষ ক'রে বঙ্গনারীদের, দরদী যে কত বেশী ছিলেন, তা বলতে পারি না। তিনি তাদের জন্যে যা ক'রেছেন ও করতে চেয়েছিলেন, তা সংক্ষেপে বলা যায় না। কেবল নারীদের জন্যেই একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলবার ইচ্ছা তাঁর ছিল; অর্থাভাবে তা ঘটে ওঠে নি। বিশ্বভারতীর আর্থিক অসচ্ছলতায় তিনি যখন বড় বেশী উদ্বিগ্ন হতেন, তখন তাঁকে বলতে শুনেছি, আর সব তুলে দিয়ে কেবল কলাভবন, সঙ্গীত-ভবন ও নারীদের জন্যে শিক্ষণব্যবস্থা সমেত শ্রীভবনটি রাখবেন।

নারীদের সম্বন্ধে তাঁর আদর্শ কি ছিল? তাঁর বহু কবিতা, উপন্যাস, ছোট গল্পে এ প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। এই প্রসঙ্গে সাধারণতঃ "চিত্রাঙ্গদা"র নিম্নোদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলি উল্লিখিত হয়ে থাকে।

পরীক্ষার সময় তাদের উপর কোন পাহারা না রেখে তাদের সততা ও আত্মসম্মানের উপর নির্ভর করার প্রথাও তিনি প্রবর্তিত করেন।

ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির রূপ পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে তাঁর প্রভাব অনুভব সম্বন্ধে সকলকে জাগরিত করবার জন্যে কবি ঋতু-উৎসবগুলি প্রবর্তন করেন;—যেমন বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বসন্ত-উৎসব।

আর্তের সেবা, রোগীর সেবাশুশ্রূষা তিনি শুধু বাক্যে প্রচার ক'রে ক্ষান্ত হন নি, কাজেও করেছেন। তার একটি অনুপ্রাণনাপূর্ণ আখ্যান এই মাসের প্রবাসীর কষ্টিপাথরে দেওয়া হয়েছে।

তাঁকে "গুরুদেব" সম্বোধন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় আরম্ভ করান, ও সতীশচন্দ্র রায় প্রচলিত করেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রত্যহ একা একা ১৫ মিনিট ধ্যানের এবং সকালসন্ধ্যা সম্মিলিত স্তবগান দ্বারা উপাসনা রবীন্দ্রনাথ নিজের বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত করেন।

বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তারের জন্য কবি "লোকশিক্ষা-সংসদ" স্থাপন ক'রে গেছেন। এর জন্যে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়েছে। এর অশেষ সম্ভাব্যতা আছে।

কবি বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা শুধু এ অর্থে নয়, যে, এর আদর্শ ও পরিকল্পনা তাঁর, এবং তিনি এর জন্যে যথাসাধ্য টাকা দিয়েছেন, টাকা সংগ্রহ করেছেন, ঘরবাড়ী বানিয়েছেন; পরন্তু এই অর্থেও যে, তিনি এর জন্যে শেষ পর্য্যন্ত পরিশ্রম করেছেন; এর কেরানীগিরি পর্য্যন্ত ক'রেছেন; স্বয়ং ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে অসাধারণ নৈপুণ্য ও ধৈর্য্য সহকারে পড়িয়েছেন; কিছুদিন আগেও নিজের কবিতা ব্যাখ্যা করেছেন; গান, অভিনয়, নৃত্য শিখিয়েছেন; তাদের সভায় সভাপতিত্ব করেছেন; তাদের গল্প ব'লে চিত্তবিনোদন করেছেন; তাদের সঙ্গে খেলা করেছেন; মন্দিরে উপাসনা ও ভাষণ দ্বারা অনুপ্রাণনা দিয়েছেন; তাঁর স্বর্গগতা সহধর্মিণী প্রথম অবস্থায় নিজের অলঙ্কার এই প্রতিষ্ঠানকে দিয়েছেন এবং অধ্যাপক ও ছাত্রদেরকে দিনের পর দিন পরম সমাদরে স্বহস্তে রেঁধে খাইয়েছেন। দেহমনের অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যের অধিকারী কবির অন্য ব্যসন তো ছিলই না; পান তামাকে অভ্যাস পর্য্যন্ত না-থাকায় তিনি সকলের আদর্শ 'গুরুদেব' ছিলেন।

বেশেই থাকতে ভালবাসতেন। উপরন্তু কবির উন্নত রুচির প্রভাব তাঁকে আরও সাদাসিধা ক'রে তুলেছিল।"

"কবি-পত্নী একবার সাধ ক'রে সোনার বোতাম গড়িয়েছিলেন কবির জন্মদিনে কবিকে পরাবেন বলে। কবি দেখে বলেন, ছি ছি ছি, পুরুষে কখনও সোনা পরে—লজ্জার কথা।"

"কবি-পত্নীর রান্নার হাত ছিল চমৎকার।"

"নূতন নূতন রান্না আবিষ্কারের সখ কম ছিল না কবিরও। বোধ হয় পত্নীর রন্ধনকুশলতা এ-সম্বন্ধে তাঁর সখ বাড়িয়ে দিত বেশী। রন্ধনরতা পত্নীর পাশে মোড়া নিয়ে ব'সে নূতন রান্নার ফরমাস করছেন কবি, দেখা গেছে অনেক বার। শুধু ফরমাস ক'রেই ক্ষান্ত হতেন না, নূতন মালমসলা দিয়ে নূতন প্রণালীতে পত্নীকে নূতন রান্না শিখিয়ে কবি সখ মেটাতেন। শেষে তাঁকে রাগাবার জন্যে গৌরব ক'রে বলতেন, 'দেখলে তোমাদের কাজ তোমাদেরই কেমন একটা শিখিয়ে দিলুম।' তিনি চটে গিয়ে বলতেন, 'তোমাদের সঙ্গে পারবে কে? জিতেই আছ সকল বিষয়ে।"

"সংসারে এক উপদ্রব বাধাতেন কবি নিজের খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে। থেকে থেকে খাওয়া এত কমিয়ে ফেলতেন যে, কাছের লোকে চিন্তিত না হয়ে থাকতে পারত না। করো চিন্তা, বলো যা খুশি,—কবি নিজের ইচ্ছায় ভর ক'রেই চলেছেন। জন্ম হ'তে অটুট স্বাস্থ্য পাওয়ায় ও বয়সের জোর থাকায় শরীর তখন এই সব উপদ্রব সহ্য করেছে অনেকটা অনায়াসে। ঘরের লোকের ধারণা, খেয়ালের বসে কবি স্বল্পাহারে শরীর নষ্ট করছেন; কাজেই এই ব্যাপার তাঁরা উপদ্রব ব'লেই গণ্য করতেন। কবি যে শরীরের উপযোগী খাদ্য না খুঁজে মনের উপযোগী খাদ্য খুঁজে নিচ্ছেন, এ-কথা বোঝা যেত না তখন স্পষ্ট ক'রে। ঘরের মানুষ—যাঁদের লক্ষ্য শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি, তাঁরা এমনতরো ঝোঁকালো লোক নিয়ে বেগ পেতেন সর্বদা।"

"ভৃত্যরা খুশি মনে সহজ ভাবে কবির সামনে কথা বলে, কবি সেটা ভালবাসেন চিরদিন। ভয় পেয়ে ভৃত্য কাজ করবে তিনি আদৌ পছন্দ করেন না।"

"সেই সময়কার আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কন্যা রাজবাড়ী যাবে—নিতান্ত সাধারণ সাজে সাধারণ বেশে কবি পাঠিয়েছেন তাকে

খেতেন। তাঁর অতি সুন্দর বাংলা ও ইংরেজী হাতের লেখার কথা কোন্ বাঙালী না জানে?

প্রায় ২৩ বৎসর পূর্ব্বে আমি শান্তিনিকেতনে অনেক সময় থাকতাম। তাঁর বাড়ীর সামনেই একটা বাড়ীতে থাকতাম—মধ্যেখানে ছিল একটা মাঠ। তিনি তখন এমন পরিশ্রমী ছিলেন যে, একদিনও রাত্রে তাঁর লিখবার পড়বার ঘরের আলো আমাকে শুতে যাবার আগে নিবতে দেখি নি। প্রত্যুষে বেড়াতে গিয়ে দেখেছি, হয় তিনি বারাণ্ডায় উপাসনায় বসেছেন নতুবা উপাসনা সেরে লেখা বা পড়ার কাজে লেগে গেছেন। সেকালে দুপুরে খাবার পরও তাঁকে কখনও শুতে বা হেলান দিতে দেখি নি; গ্রীষ্মে কাউকে তাঁকে পাখার বাতাস দিতে বা তাঁকে নিজে হাত-পাখা চালাতে দেখি নি। তখন শান্তিনিকেতনে বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা ছিল না। বহু বৎসর পরেও তাঁর শ্রমশীলতায় বিস্মিত হয়েছি। পরে বার্দ্ধক্যে ও ভগ্ন স্বাস্থ্যে তিনি ঠিক তেমনটি ছিলেন না বটে, কিন্তু তখনও অনেক যুবকের চেয়ে তিনি বেশী পরিশ্রম করতেন। এই সেদিনও গান্ধীজী তাঁকে দুপুরে বিশ্রাম করতে অঙ্গীকার করিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর অসামান্য মেধার ও প্রতিভার পরিচয়ও শেষ পর্য্যন্ত পাওয়া গেছে।

ঋষিদের যে আধ্যাত্মিক সত্য দৃষ্টির শক্তি ছিল ব'লে আমরা পড়েছি, রবীন্দ্রনাথের তা ছিল। তাঁর বহু ধর্মোপদেশে, কবিতায় ও সঙ্গীতে তার পরিচয় আছে। বিলাসী তিনি ছিলেন না, আবার কৃচ্ছ্রসাধকও বরাবর ছিলেন না—যদিও নিজের আহার সম্বন্ধে কখনও কখনও অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা করতেন। জীবনকে তিনি ভালবাসতেন। তিনি বলেছেন,

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

কিন্তু মৃত্যুকেও তিনি মাতৃহস্তের মতই স্নেহময় ও নির্ভরযোগ্য মনে করতেন; তাই মৃত্যুর সম্বন্ধে বলেছেন :—

"সে যে মাতৃপাণি,
স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি।
স্তন হতে তুলে নিলে শিশু কাঁদে ডরে,
মুহূর্ত্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।"

পত্নীর মহাপ্রয়াণে তিনি মর্ম্মন্তুদ বেদনায় "স্মরণ" গ্রন্থের প্রথম কবিতায় প্রার্থনা করেছিলেন :—

"আজি মোর কাছে প্রভাত তোমার
　　কর গো আড়াল কর'।
এ খেলা এ মেলা এ আলো এ গীত
　　আজি হেথা হ'তে হ'য়;
প্রভাত-জগত হতে মোরে ছিঁড়ি,
করুণ আঁধারে লহ মোরে ঘিরি',
উদাস হিয়ারে তুলিয়া বাঁধুক
　　তব স্নেহ বাহু ডোর।"

ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে ব্যবধান সত্ত্বেও এই দম্পতি অভিন্নাত্মা হয়েছিলেন। কবি স্বর্গগতা পত্নীকে সম্বোধন ক'রে বলেছেন :—

"আমার জীবনে তুমি বাঁচ ওগো বাঁচ।
তোমার কামনা মোর চিত্ত দিয়ে যাচ।
　　যেন আমি বুঝি মনে
　　অতিশয় সঙ্গোপনে
তুমি আজি মোর মাঝে আমি হয়ে আছ।
আমারি জীবনে তুমি বাঁচ ওগো বাঁচ।"

আকাঙ্ক্ষা ছিল, কবির আগে আমার মৃত্যু হবে। রবীন্দ্রবিহীন জগতের কল্পনা কখনও করি নাই। ভাবি নাই রবীন্দ্রবিহীন জগৎ দেখতে হবে। চোখ কান যাই বলুক, বিশ্বাস হচ্ছে না যে তিনি নাই। এখনও মনে হচ্ছে, শান্তিনিকেতনে গেলেই আবার তাঁর বার্দ্ধক্যের সেই শুচিশুভ্র সুন্দর রূপ দেখতে পাব যার ভিতর দিয়ে তাঁর অন্তরের অনুপম শ্রী বিচ্ছুরিত হোতো। "ক্রন্দন ধ্বনিছে পথহারা পবনে,"—যদিও বুদ্ধি বলছে তিনি আছেন।

তাঁর কামনা ছিল—

"এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক,
চৈতন্যের শুভ্রজ্যোতি
ভেদ করি' কুহেলিকা
সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।

"আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সে-ও আমি
নই; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সে-ও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।"

"মহুয়া"র 'সবলা' কবিতায় অন্য সুরের ঝঙ্কার পাই। ঐ গ্রন্থের 'নাম্নী' কবিতাবলীতে ১৭টি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নারীচিত্র আছে।

"আরোগ্য" গ্রন্থে 'নারী তুমি ধন্যা' কবিতায় সাধারণ গৃহস্থ ঘরের অন্তঃপুরিকাদের মহনীয় বহু স্বরূপের বন্দনা কবি করেছেন।

কবি তাঁর সহধর্মিণীর পরলোকযাত্রার পর "স্মরণ"-শীর্ষক কবিতাগুলি লিখেছিলেন, কিন্তু তাতে তাঁর দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের কোন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাঁর অন্য কোন গ্রন্থেও তা নাই। তাঁর কথাবার্ত্তাতেও তিনি এ বিষয়ে নির্বাক্ থাকতেন। ১৩৪৬ সালের পৌষের "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত হেমলতা দেবী 'সংসারী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটিতে এই বিষয়ে আলোকপাত ক'রেছেন। তাতে আমরা দেখতে পাই, সহধর্মিণীর প্রতি কবির প্রেম কী গভীর ছিল। কবির সন্তানস্নেহ, ভৃত্যদের প্রতি সদয় ব্যবহার প্রভৃতির সন্ধানও তাতে আছে। কবিকে যাঁরা বুঝতে চান, তাঁদের এই প্রবন্ধটি পড়া একান্ত আবশ্যক। এর থেকে কতকগুলি বাক্য উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি।

"বিদ্যালয়-স্থাপনার পরে ছাত্রদের মধ্যে থাকবেন ব'লে শান্তিনিকেতনের বর্তমান লাইব্রেরি-বাড়ীর এক পাশের একটি ঘরে কবি বাস করেছেন অনেকদিন, খেতেন ছাত্রদের খাওয়ার সারে বসে—এক সঙ্গে একই খাদ্য।

"কবি-পত্নী স্বভাবত অতিরিক্ত সাজসজ্জায় আদৌ অনুরাগী ছিলেন না, গহনা পরতেন নিতান্ত সামান্য। বড় ঘরের বৌ, তার তুলনায় তিনি সাধারণ

এই "শুভ শঙ্খধ্বনি" শুনবার আশায় আছি—এ তো আকাশে বাতাসে মিলিয়ে যাবার নয়। ধ্বনি শুনে কবির—

"কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি?"

এই প্রশ্নের উত্তরে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলতে পারব, "সকল প্রভাতেই কবি তুমি আছ";

"সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি।
নতুন নামে ডাকবে মোরে,
বাঁধবে নতুন বাহু-ডোরে,
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।"

দিব্যধামবাসীদের মধ্যে কবির শুভ আগমনের উৎসবকলরোল মিশ্রিত সেই শঙ্খধ্বনি শুনে তখন তাঁর ঐ কথাগুলির অর্থও হৃদয়ঙ্গম হবে। তখন আর এখনকার মত বলতে হবে না,

"ক্রন্দন ধ্বনিছে পথহারা পবনে।"

উৎস : *প্রবাসী*, ভাদ্র, ১৩৪৮, পৃ. ৬৪১-৬৪৪ (জ)।

সেখানে। আত্মীয়েরা বলেছেন, 'এমন সাজে কবি রাজবাড়ী কন্যা পাঠান যে দেখে লজ্জা করে।' কবির উত্তর, 'এই বেশে কন্যা আমার স্নেহ-সম্মান যদি না পায়, তবে তেমন সম্মানে কাজ নাই। বেশভূষা যে-সম্মানের যোগ্যতা প্রমাণ করে, সে-সম্মান না পাওয়াই শ্রেয়'।"

"সন্তান-স্নেহ কবির অপরিমেয়। প্রথম সন্তান, কন্যাটিকে পিতা হয়েও তিনি মাতৃস্নেহে পালন করেছিলেন ধাত্রীরূপে। পত্নীয় বয়স ছিল কম, কবি যেন ভরসা পেতেন না প্রথম সন্তানের সম্যক্ যত্ন পাছে তিনি করতে না পারেন ভেবে। শিশুকে দুধ খাওয়ানো, কাপড় পরানো, বিছানা বদলানো কবি সব করতেন নিজের হাতে, এ-সবই আমাদের চোখে দেখা।"

শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী এর পর কবি কর্তৃক পত্নীর সেবার যে পবিত্র চিত্রটি দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ যদি মহাপুরুষ না হ'তেন তা হ'লেও তারই জন্যে তিনি জগজ্জনের চির-আরাধ্য হয়ে থাকতেন।

"শিক্ষাব্রতী কবি আদর্শ-শিক্ষালয় গঠনে যখন প্রবৃত্ত, কবির সহধর্মিণী তখন সহকর্মিণী হয়েছিলেন তাঁর সে কাজে। ছাত্রদের জলখাবার তৈরির ভার নিয়েছিলেন তিনি নিজের হাতে। স্নেহ দিয়ে গড়তে চেয়েছিলেন ছাত্রগুলিকে। বিদ্যালয় আরম্ভের একটি বৎসর শেষ না হতেই বিদ্যালয়ের জননী কবি-পত্নীর আয়ু হ'ল শেষ। কবির সংসার ভেঙে দিয়ে তিনি চলে গেলেন অকালে। মৃত্যুশয্যায় কবি নিজের হাতে তাঁর যে শুশ্রূষা করেছিলেন, তার ছাপটি মুদ্রিত হয়ে রয়েছে পরিবারের সকলের মনে আজও। প্রায় দু-মাস তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন; ভাড়া করা নার্সদের হাতে পত্নীর শুশ্রূষার ভার কবি এক দিনের জন্যও দেন নাই।

"স্বামীর সেবা পাওয়া কত সৌভাগ্যের, সাধ্বী নারী মাত্রই জানেন। পত্নীর প্রতি স্নেহ কবির প্রকাশ পেয়েছে তাঁর শেষ শয্যায় চূড়ান্ত রূপে। তখন ইলেকট্রিক ফ্যানের সৃষ্টি হয় নাই দেশে। হাতপাখা হাতে ধ'রে দিনের পর দিন রাতের পর রাত পত্নীকে কবি বাতাস দিতেন, এক মুহূর্ত্ত হাতের পাখা না ফেলে। ভাড়াটে শুশ্রূষাকারিণীর প্রচলন তখন ঘরে ঘরে; কবির ঘরে তার ব্যত্যয় ঘটল প্রথম।"

কবি অন্যান্য বিষয়ে যেমন অসাধারণ, শোকও পেয়েছেন সেইরূপ অত্যধিক, এবং সহ্য করেছেন সেইরূপ অসাধারণ ধৈর্য্য ও সংযমের সহিত।

ইতিপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের বা তাঁহার পরিবারের কাহারো সহিত মহারাজ বীরচন্দ্রের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। এ সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "জীবন-স্মৃতি"তে লিখিয়াছেন :—

"মনে আছে, এই লেখা বাহির হইবার কিছুকাল পরে কলিকাতায় ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের মন্ত্রী আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। কাব্যটি মহারাজের ভাল লাগিয়াছে, এবং কবির সাহিত্য সাধনার সফলতা সম্বন্ধে তিনি উচ্চ আশা পোষণ করেন, কেবল এইটি জানাইবার জন্যই তিনি তাঁহার অমাত্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।"

বাস্তবিক এ ঘটনা রবিবাবুর পক্ষে অপ্রত্যাশিত এবং বিস্ময়-উৎপাদক হইয়াছিল। বাংলার রাজা বাংলার এই কবিকে কিশোর বয়সেই এরূপ অযাচিত সম্মান দান করিলেন, ইহা এক অপূর্ব্ব ঘটনা বলিতে হইবে। শাস্ত্র বলে,—

গুণী গুণ বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণঃ।

মহারাজা বীরচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন; তা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করতেন তার নিম্নমুদ্রিত বর্ণনা মহিমচন্দ্রের প্রবন্ধে আছে।

বীরচন্দ্র মাণিক্য কলিকাতায় যখনই যাইতেন, তখনই রবিবাবুকে ডাকাইয়া আনিতেন। বয়সে এই দুই কবির বিশেষ পার্থক্য থাকিলেও বীরচন্দ্র বাৎসল্যভাবে কিশোর সৌম্যদর্শন কবি রবীন্দ্রনাথের মুখে কবিতা পাঠ এবং সঙ্গীত শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন। রবীন্দ্রনাথ পিতৃতুল্য বীরচন্দ্রের নিকট কবিতা পাঠ বিশেষতঃ গান করিতে নিতান্ত সঙ্কোচ বোধ করিতেন। কিন্তু বীরচন্দ্রের স্বভাবসুলভ উৎসাহে রবীন্দ্রনাথের সঙ্কোচের বাধা অতিক্রম করা সহজসাধ্য হইত। আমরা যখন কলিকাতা হইতে ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারকল্পে রুগ্ন মহারাজ বীরচন্দ্রকে লইয়া কার্সিয়াং-এ গমন করি, তখন মহারাজ, কবি রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া লইলেন। তখনকার কথা আমার বেশ স্মরণ আছে। রাত্রে প্রায় ১০টা বাজিয়া যাইত, অবিশ্রামভাবে মহারাজ রবীন্দ্রনাথকে লইয়া সঙ্গীত এবং কাব্য আলোচনায় মগ্ন থাকিতেন; বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেন।

সর্ব মানুষের মাঝে
এক চিরমানবের আনন্দকিরণ
চিত্তে মোর হোক বিকীরিত।
সংসারের ক্ষুব্ধতার স্তব্ধ ঊর্ধ্বলোকে
নিত্যের যে শান্তিরূপ তাই যেন দেখে যেতে পারি,
জীবনের জটিল যা বহু নিরর্থক,
মিথ্যার বাহন যাহা সমাজের কৃত্রিম মূল্যেই,
তাই নিয়ে কাঙালের অশান্ত জনতা
দূরে ঠেলে দিয়ে
এ জন্মের সত্য অর্থ স্পষ্ট চোখে জেনে যাই যেন
সীমা তার পেরবার আগে।"

"এ জন্মের সত্য অর্থ" তিনি জেনে গেছেন।

তিনি বিশ্বজনকে এত দিয়েও তৃপ্ত হন নাই। আরও কিছু দিতে চেয়েছিলেন—নিশ্চয় দিয়েও গেছেন, নেবার যোগ্য হ'লেই, নিতে জান্‌লেই পাব :—

"আমি কিছু দিতে চাই, তা না হোলে জীবনে জীবনে
মিল হবে কি করিয়া, আসি না নিশ্চিত পদক্ষেপে,
ভয় হয় রিক্ত পাত্র বুঝি, বুঝি তার রসস্বাদ
হারায়েছে পূর্ব পরিচয়, বুঝি আদানে প্রদানে
র'বে না সম্মান, তাই আশঙ্কায় এ দূরত্ব হ'তে
এ নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গতা মাঝে তোমাদের ডেকে বলি,—
যে জীবনলক্ষ্মী মোরে সাজায়েছে নব নব সাজে
তার সাথে বিচ্ছেদের দিনে নিভায়ে উৎসবদীপ
দারিদ্র্যের লাঞ্ছনার ঘটাবে না কভু অসম্মান,
অলংকার খুলে নেবে, একে একে বর্ণসজ্জাহীন উত্তরীয়ে
ঢেকে দিবে, ললাটে আঁকিবে শুভ্র তিলকের রেখা;
তোমরাও যোগ দিয়ো জীবনের পূর্ণ ঘট নিয়ে
সে অন্তিম অনুষ্ঠানে, হয়তো শুনিবে দূর হতে
দিগন্তের পরপারে শুভ শঙ্খধ্বনি।"

হয়েছে। বাল্যের রচনা, অসম্পূর্ণতা ইত্যাদি অনেক ত্রুটি থাকায়, পুনঃ প্রকাশিত হয় নাই।

সেই সময়ে আমাকে এবং আমার লেখা সম্বন্ধে খুব অল্প লোকেই জানতেন। আমার পরিচয় তখন কেবল আমার আত্মীয়স্বজন নিকটতম বন্ধুজনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। একদিন, এই সময়ে ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের দূত আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। বালক আমি, সসঙ্কোচে আমি তাঁকে অভ্যর্থনা করলাম। আপনারা হয়তো অনেকেই দূত মহাশয়ের নাম জানেন—তিনি রাধারমণ ঘোষ। মহারাজ তাঁকে সুদূর ত্রিপুরা হ'তে বিশেষভাবে পাঠিয়েছিলেন কেবল জানাতে যে, আমাকে তিনি কবি-রূপে অভিনন্দিত করতে ইচ্ছা করেন। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বালক কবির বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

এরপর থেকে নানা সময়ে নানা উপদেশ এবং বিশেষ করে "রাজর্ষি" লিখিবার সময়ে "রাজমালা" থেকে সংস্কৃত বিষয়গুলি ছাপিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তার থেকে আমি গোবিন্দ মাণিক্যের প্রকৃত ইতিবৃত্ত জানতে পেরেছিলুম।

তিনি কার্সিয়াং-এ যাবার সময় আমাকে তাঁর সঙ্গে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ করলেন। আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় তিনি আমার লেখা শুনতেন আর গান গাইতে বলতেন। তাঁর স্নেহ, আদর আমার প্রাণে স্থায়ী রেখা টেনে গেছে।

মহারাজ বীরচন্দ্র অসাধারণ সঙ্গীতবিশারদ ছিলেন। তাঁর কাছে আমার মত অনভিজ্ঞের গান-গাওয়া যে কত দূর সঙ্কোচের ছিল তা সহজেই অনুমেয়। কেবলমাত্র তাঁর স্নেহের প্রশ্রয়ে আমাকে সাহস দিয়েছিল।

তিনি যে আমার কাছে আবৃত্তি ও সঙ্গীত আলাপ শুনেই আমাকে রেহাই দিতেন তা নয়; তিনি তাঁর বিষয়কর্ম্মেও আমার শক্তিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন।

জীবনে যে যশ আজ আমি পাচ্ছি, পৃথিবীর মধ্যে তিনিই তার প্রথম সূচনা করে দিয়েছিলেন, তাঁর অভিনন্দনের দ্বারা। তিনি আমার অপরিণত আরম্ভের মধ্যে ভবিষ্যতের ছবি তাঁর বিচক্ষণ দৃষ্টির দ্বারা দেখতে পেয়েই তখনি আমাকে কবি সম্বোধনে সম্মানিত করেছিলেন। যিনি উপরের শিখরে থাকেন, তিনি যেমন যা সহজে চোখে পড়ে না তাঁকেও দেখতে পান, বীরচন্দ্র তেমনি সেদিন আমার মধ্যে অস্পষ্টকে স্পষ্ট দেখেছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর অনতিকাল পূর্ব্বে যখন আমি তাঁর আতিথ্য ভোগ করেছিলেম, সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে সাহিত্য সম্বন্ধে নানা রকম আলাপ হতো। বৈষ্ণব

ত্রিপুরার রাজবংশ ও রবীন্দ্রনাথ

ত্রিপুরার রাজবংশের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের পরিচয় ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের জন্মের বহুপূর্বে। কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখে গেছেন, ত্রিপুরার বর্তমান মহারাজা বাহাদুরের প্রপিতামহ মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের পিতা মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য কোন গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে কলকাতায় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাহায্যার্থী হন। দ্বারকানাথ তখনকার কলকাতার সমাজের এবং রাজনৈতিক সব ব্যাপারের নেতা ছিলেন। তাঁর সহায়তায় মহারাজ কৃষ্ণকিশোর সে-যাত্রা সফলকাম হ'য়ে ত্রিপুরা প্রত্যাগমন করেন। ত্রিপুরার রাজপরিবারের সহিত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের বোধহয় এই প্রথম পরিচয়।

রবীন্দ্রনাথের সহিত এই রাজবংশের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আরম্ভ হয় মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য মহোদয়ের আমলে। তার বৃত্তান্ত তাঁর "জীবন-স্মৃতি"তে এবং আগরতলার কিশোর সমাজে ১৩৩২ সালের তাঁর একটি বক্তৃতাতে আছে। এ বিষয়ে কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর তাঁর পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে লিখেছেন :—

> প্রিয়তমা প্রধানা মহিষীর অকালমৃত্যুতে প্রৌঢ় বীরচন্দ্রের হৃদয় অসহনীয় প্রিয়-বিরহে শোকাকুল হইয়া পড়ে। তখন তিনি বিরহীর মর্ম্মবেদনা কবিতার লহরে লহরে গাঁথিতেছিলেন। এমনি সময়ে কিশোর-কবি রবীন্দ্রনাথ বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া "ভগ্ন হৃদয়" নামে এক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। কবি বীরচন্দ্রের তখনকার মানসিক ভাবের সহিত 'ভগ্ন হৃদয়ে'র কবিতাগুলি সায় দিয়াছিল। গুণগ্রাহী বীরচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের তখনকার এই কাঁচা লেখার মধ্যেও তাঁহার অদ্যকার বিশ্ববিমোহন কাব্যপ্রতিভার প্রথম সূচনা দেখিতে পাইয়া, তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী স্বর্গীয় রাধারমণ ঘোষকে কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে প্রেরণ করেন, 'ভগ্ন হৃদয়' কাব্যগ্রন্থ মহারাজকে প্রীত করিয়াছে, তজ্জন্য তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে।

এই পরিবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আমি দেখেছি। এই পরিবারের সঙ্গে আমার যোগ সেই অনুরাগ-সূত্রে দৃঢ়তর হয়েছিল।

রাধাকিশোর ও বীরচন্দ্রের লেখার মত চিঠি আমি খুব অল্পই দেখেছি। সেগুলি যেমন সংযত, তেমনি সুসংস্কৃত—তেমনি সরস। মাতৃভাষাকে এমন সুনিপুণভাবে ব্যবহার করা এ যে তাঁদের রাজোচিত সৌজন্যেরই অঙ্গ। এই বৈদগ্ধ্যে, স্বদেশের সঙ্গীত-শিল্প-সাহিত্যের এই রসজ্ঞতায় তাঁদের আভিজাত্যের গৌরব ঘোষণা করে। এই সঙ্গে তাঁদের স্বাভাবিক নম্রতা দেখেছি সেই নম্রতা আমার কাছে তাঁদের চরিত্রের উচ্চতারই পরিচয় দিয়েছিল।

ব্রজেন্দ্রকিশোর তখন বালক, যখন তিনি আমার নিকটে এসেছিলেন। তিনি তাঁর ব্যবহার ও আচরণে আমার নিকটতম আত্মীয়ের স্থান গ্রহণ করেচেন। বালককাল থেকেই তিনি আমার সঙ্গে পত্র ব্যবহার করতেন। ইহা যে ব্যর্থ হয় নাই, ইহাই আমার পরম আনন্দ। আমি ত্রিপুরার রাজ্যের আর কোনো হিত যদি না করে থাকি, কেবলমাত্র যদি ব্রজেন্দ্রকিশোরের চরিত্রকে কর্তব্যের দীক্ষায় দৃঢ় করতে পেরে থাকি, তবে তাঁর দ্বারা ত্রিপুরার স্থায়ী কল্যাণসাধন করেছি বলে গৌরব করতে পারবো। এই উপলক্ষে আমি তাঁকে আমার সর্ব্বান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ দিয়ে যাচ্ছি। আজকের দিনে এখানকার পূর্ব্বস্মৃতি আমার মনে বিষাদের ছায়া ফেলেচে। আমার একমাত্র আনন্দ, এখানে ব্রজেন্দ্রকিশোরকে দেখলাম। নিজের স্বাস্থ্য ও কাজ উপেক্ষা করেও তাঁর আমন্ত্রণে এখানে উপস্থিত হয়েছি। এঁর পিতার ও পিতামহের কাছ থেকে যে সমাদর পেয়েছি, আজও তা এঁরই হাত দিয়ে ভোগ করতে পারছি। সেই জন্য আজ বসন্তে ত্রিপুরার বন-শ্রী যখন দক্ষিণ বাতাসে দিকে দিকে পুষ্পোৎসবের আমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন, তখন আমি এঁরই কাছ থেকে এঁর পিতৃসখারূপে সেই মাল্য গ্রহণ করতে এসেচি, যা এঁর পিতা পিতামহ তাঁদের প্রীতিভাজন এই অতিথির জন্য সজ্জিত করে রেখে দিতেন।

আমি এঁর কল্যাণ কামনা করি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কামনা করি যে, এঁর চরিত্র মহিমায় ত্রিপুরা রাজ্যের কল্যাণ বর্ধিত হউক।

এই উপলক্ষে ত্রিপুরার রাজগণের প্রতি আমি আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে ইচ্ছা করি। আজ বিশ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল শান্তিনিকেতনে বিদ্যায়তন স্থাপন করেছি। সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আমাদের দেশের লোকের মধ্যে একমাত্র রাধাকিশোর মাণিক্যের কাছ থেকে আমি নিয়মিত আনুকূল্য পেয়েছি। তিনি স্বয়ং আমাদের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ ক'রে আমাদের আনন্দিত ও

আলোচনান্তে প্রতি রাত্রে মহারাজ উঠিয়া রবিবাবুকে সিঁড়ি পর্য্যন্ত আসিয়া বিদায় সম্ভাষণ করিয়া যাইতেন। মহারাজ বীরচন্দ্র অসুস্থ। অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া হাস্যমুখেই তিনি আলোচনায় যোগ দিতেন, এ কথা রবিবাবু জানিতেন। তিনি এক দিন, মহারাজ অনর্থক কেন কষ্ট করিয়া সিঁড়ি পর্য্যন্ত তাঁহাকে আগাইয়া দেন এরূপ অনুরোধ করিলেন। তখন বীরচন্দ্র বলিয়াছিলেন, ‘‘রবিবাবু, পাছে অলসতা আসিয়া কর্তব্যে ত্রুটি ঘটায়, আমি সেই ভয় করি, আপনি আমাকে বাধা দিবেন না।’’ পিতৃতুল্য বীরচন্দ্রের এরূপ ব্যবহার দর্শন এবং উত্তর শ্রবণ করিয়া রবিবাবু বলিতেন, ‘‘আমি অভিজাত-বংশের মহিমায় পরিচয় পাইয়া ধন্য হইলাম।’’

বীরচন্দ্র মাণিক্যের সভায় একটি রত্নের পরিচয় পাইয়া পরম আনন্দ পাইয়াছেন বলিয়া রবিবাবুকে বলিতে শুনিয়াছি; তিনি ছিলেন রাধারমণ ঘোষ। রবিবাবু রাধারমণবাবুকে লইয়া বৈষ্ণব দর্শন এবং পদাবলী আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। একদিন Photo তুলিয়া প্রায় ১টার সময় বাসায় আসিয়া দেখিলাম, রাধারমণবাবু ও রবিবাবু আলাপে তন্ময় হইয়া আছেন। তখন বৈষ্ণব দর্শন সহিত এমার্সনের (Emerson-এর) লেখার তুলনামূলক আলোচনা চলিতেছিল। আমি আসিয়া রসভঙ্গ করিয়া দিলাম; কারণ, আমার উদরে ক্ষুধানল প্রজ্বলিত। তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও রবিবাবুকে সে আলোচনা স্থগিত রাখিতে হইল। ভাবে বুঝিলাম, এই শীর্ণকায় রাধারমণ ঘোষ তাঁহাকে বেশ পাইয়া বসিয়াছেন। রবিবাবু, রাধারমণের গভীর পাণ্ডিত্যে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে বৈষ্ণব দর্শন পাঠ করিতে হইবে এ কথা তিনি স্বীকার করিলেন। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় বেড়াইতে বাহির হইলে রবিবাবু মহারাজ বীরচন্দ্র এবং তাঁহার সহচর রাধারমণের প্রসঙ্গ অনর্গল, আলোচনা করিতেন। ইহাতে বুঝা যায় রবিবাবুর গুণ গ্রহণ করিবার শক্তির প্রখরতা।

বীরচন্দ্র মাণিক্য কলিকাতায় দেহত্যাগ করিলেন।

১৩৩২ সালে রবীন্দ্রনাথ আগরতলায় ‘কিশোরসমাজে’ সম্বর্ধিত হ’য়ে যে বক্তৃতা করেন, তাতে তাঁর ত্রিপুরা-রাজবংশের সহিত প্রথম পরিচয়ের ও পরবর্তী ঘনিষ্ঠতার কথা তিনি বলেছিলেন। আগরতলার অধুনালুপ্ত ‘রবি’ পত্রিকা থেকে সেই বক্তৃতাটি নিচে উদ্ধৃত হ’ল।

এই ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে আমার যে প্রথম পরিচয়, তা খুব অল্প বয়সে। সদ্য England থেকে ফিরে এসেছি; তখন একখানি মাত্র কাব্য প্রকাশিত

গোবিন্দমাণিক্য তাঁহার নির্বাসনদশায় চট্টগ্রামের কোন্ স্থানে কিরূপ অবস্থায় ছিলেন যদি জানিতে পাই, তবে আমার যথেষ্ট সাহায্য হয়। প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরের এবং ঐতিহাসিক ত্রিপুরার অন্যান্য স্থানের ফটোগ্রাফ যদি পাওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলেও আমার উপকার হয়।"

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য রবীন্দ্রনাথের এই পত্রের দীর্ঘ উত্তর দিয়েছিলেন। তাতে কবির "মুকুট" নাটকেরও উল্লেখ ছিল। বীরচন্দ্র "রাজরত্নাকর" ও "রাজমালা" থেকে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সংকলন ক'রে দিতে পারবেন লিখেছিলেন।

উৎস : *প্রবাসী*, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮, পৃ. ২২০-২২২। উল্লেখ্য যে, এই রচনাটির সঙ্গে স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র দেববর্মন মাণিক্যের ছবি (ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মন-প্রণীত *দেশীয় রাজা*, ১ম ভাগ থেকে গৃহীত) ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ও মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের একটি যুগল আলোকচিত্রও ছাপা হয়েছিল।

পদাবলী যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ ও প্রকাশ করবার অভিপ্রায়ে এক লক্ষ টাকা ধার করবার সঙ্কল্প তাঁর ছিল। কিন্তু তার পরই তাঁর সহসা মৃত্যু হওয়াতে সে সঙ্কল্প সফল হতে পারে নি।

বীরচন্দ্রের পুত্র রাধাকিশোর মাণিক্য আমার প্রতি তাঁর পিতৃদত্ত সমাদরের ধারাকে রক্ষা করেছিলেন। অকৃত্রিম স্নেহে তিনি আমাকে কাছে টেনে নিলেন। সেদিন রাজার হাত থেকে যখন কবির তিলক পরেছিলাম, তখনও কবির যশ সংশয়িত ও সঙ্কীর্ণ ছিল। আমার সেদিনকার বহু নিন্দা-লাঞ্ছিত-খ্যাতির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা তিনি সমভাবে রক্ষা করেছিলেন। কেবলমাত্র কবি বলেই নয়, সুহৃদ ও ভ্রাতৃভাবে তিনি আমাকে আত্মীয় ক'রে নিয়েছিলেন। সে এমন আত্মীয়তা, যা মিথ্যাস্তুতির প্রত্যাশা করত না, যা বিরুদ্ধ বাক্যকেও স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠিত হত না। মনে আছে, তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন— "রবিবাবু, আপনি আমাকে আমার ইচ্ছার ও প্রকৃতির প্রতিকূলেও রক্ষা করবেন।"

তাঁর সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যে আমি বারংবার এসেছি, তাঁর এই অকৃত্রিম স্নেহের টানে।

সেদিনও চলে গেছে। শুভ দৈববশতঃ অনেক সম্মান—এমন কি য়ুরোপীয় রাজহস্তেও * আমার ভাগ্যে জুটেছে। কিন্তু আমার এই ঘরের এবং স্বদেশের রাজার কাছ থেকে সে সম্মান লাভ করে এসেছি—ব্যক্তিগত জীবনে আমার কাছে তার মূল্য অনেক বেশী। এইজন্যই এই ত্রিপুরার সঙ্গে আমার ক্ষণিক অতিথির সম্বন্ধ নয়। এ সম্বন্ধ এখানকার রাজপিতা ও পিতামহের স্মৃতির সঙ্গেই জড়িত।

আমি একান্ত মনে এই রাজ্যের কল্যাণ কামনা করি। এই রাজ্যের যে দুইজন রাজাকে বিশেষভাবে জানবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেম, তাঁদের রাজোচিত গুণে ও রসজ্ঞতায় আমি মুগ্ধ, এমন সৌজন্য, দাক্ষিণ্য ও সহৃদয়তা দেখা যায় না।

এই রাজ পরিবারে বহুকাল থেকে বাংলা ভাষার সম্মান চলে আসছে। বস্তুতঃ সকল দেশের ইতিহাসে স্বাভাবিক অবস্থায় দেশের ভাষা কেবল মাতৃভাষা নয়, তা রাজভাষা। দেশের রাজার যেমন কর্ত্তব্য প্রজাকে পালন করা, তেমনি ভাষাকে রক্ষা করা। বিদেশী আচারের মোহে বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়ে, কোনো দিনই দেশীয় রাজন্যবর্গ এই মহৎ দায়িত্ব থেকে যেন বিচ্যুত না হন।

* যেমন বেলজিয়মে ও সুইডেনে। প্রবাসীর সম্পাদক।

পেতে ইচ্ছে করে যাকে সব বলা যায়। সে ত আর যাকে তাকে হয় না। যখন জীবনের এই যুদ্ধ চলেছে, কাজের বোঝা জমে উঠছে, মেয়ে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হচ্ছে, তখন সেইটেই সবচেয়ে কষ্ট ত যে, এমন কেউ নেই যাকে সব বলা... (যায়)।"

যাকে সব বলা যায় এমন মানুষের অভাব খুব বড় অভাব—যদিও সব মানুষ এ অভাব অনুভব করে না। স্ত্রী-স্বামীকে সব কথা বলতে পারেন, স্বামীও স্ত্রীকে সব কথা বলতে পারেন, যদি দম্পতির উভয়ে পরস্পরের সম্পূর্ণ প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হন। কিন্তু এরূপ দম্পতি সংসারে খুব বিরল না হ'লেও বিরল! যে স্বামী স্ত্রীকে সব কথাই বলতে পারেন এবং যাঁর স্ত্রী তাঁর সব ভাব ও চিন্তার অংশ গ্রহণ করতে পারেন, তিনি সৌভাগ্যবান্। রবীন্দ্রনাথের সেই সৌভাগ্য হ'য়েছিল, কিন্তু বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। মৃণালিনী দেবী সম্বন্ধে আমরা আর কিছু জানি বা না জানি, তাঁকে রবীন্দ্রনাথের মত মানুষ সব কথা বলতে পারতেন ও বলতেন, কেবল এর থেকেই বুঝতে পারি বিধাতা তাঁকে কিরূপ মহত্ত্বের উপাদানে গড়েছিলেন এবং তাঁর জীবন দীর্ঘতর হ'লে তিনি জনসমাজে কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করতেন। যাঁর ভাবনা চিন্তা কেবল নিজের বা নিজের পরিবারের জন্যে নয়, এমন কি শুধু নিজের দেশের জন্যেও নয়, সারা জগতের কল্যাণ অকল্যাণের চিন্তায় যাঁর হৃদয় মন আলোড়িত হ'ত, তাঁর ভাব ও চিন্তার, সাধনায় ও তপস্যার, আনন্দ ও বিষাদের গুরুভার শুধু চিন্তাতেও গ্রহণ ও বহন সামান্য কাজ নয়।

এরূপ মহিলাকে রবীন্দ্রনাথ যে-সব চিঠি লিখেছিলেন তার ৩৬খানি রক্ষিত হয়েছিল। সেইগুলি "চিঠিপত্র" নাম দিয়ে বিশ্বভারতী সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের অন্য হাজার হাজার চিঠির মত এগুলিও কখনও ছাপা হবে এ ভেবে তিনি লেখেন নি। এইজন্য এইগুলিতেও তাঁর অন্তরের সরল প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। এর কোন কোনটিতে সাধারণ গৃহস্থের শাকবেগুনের কথা যেমন আছে, রসিকতা যেমন আছে, মৃণালিনী দেবীর থেকে দূরে থাকবার সময় প্রত্যহ চিঠি না পেলে যেমন উদ্বেগ অভিমান ও প্রেমরোষের প্রকাশ আছে, তেমনি ব্যক্তিগত আদর্শের, দাম্পত্য আদর্শের, সন্তানপালনের আদর্শের, সমাজের অঙ্গীভূত মানুষের কর্তব্যের উচ্চ কথাও

সম্মানিত করেছেন। সে সময় আমার এই প্রতিষ্ঠান দৈন্যপীড়িত ও অধিকাংশের অপরিজ্ঞাত ছিল। অথচ তখনই রাধাকিশোর কেবল যে বার্ষিক অর্থদানের দ্বারা এই শুভ কর্ম্মের সাহায্য করেছিলেন তা নয়, ত্রিপুরার অনেক বালককে ছাত্রবৃত্তি দিয়ে শান্তিনিকেতনে বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র বীরেন্দ্র মাণিক্যও যে কেবলমাত্র এই দানকে শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করেছিলেন তা নয়, সেকালকার হাসপাতাল নির্ম্মাণ করতে পাঁচ হাজার টাকা দান করেছিলেন এবং আরও পাঁচ হাজার টাকা দিতে স্বীকার করে গিয়েছিলেন। আমার কর্ম্মের প্রতি প্রথম থেকেই তাঁদের এই শ্রদ্ধার স্মৃতি আমার পক্ষে একান্ত সমাদরের সামগ্রী।

অবশেষে কিশোর সাহিত্য-সমাজ ও ত্রিপুরার জনসাধারণকে অদ্যকার দিনে আমার জন্য তাঁদের এই সম্মান আয়োজনের প্রতিদান স্বরূপ আমার শুভ ইচ্ছাপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এবং শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় আমাকে যে অভিবাদন করেছেন, তারই প্রত্যভিবাদন জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করি। তাঁদের কাছে আমার এই শেষ কথাটি জানিয়ে যাই যে, আমি যশোভাগ্যবান কবির মত এখানে মান নিতে আসি নি। আমি স্বর্গগত মহারাজদের বন্ধুরূপে যেমন আমার তরুণ বয়সে এখানে প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করেছি, আজ আমার শেষ বয়সেও সেই আত্মীয়তার শেষ রসটুকু ভোগ করে বলে যেতে এসেছি।

সর্ব্বস্তরতু দুর্গানি সর্ব্বো ভদ্রানি পশ্যতু।

"রাজর্ষি" উপন্যাস ও "বিসর্জন" নাটক ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাস অবলম্বন ক'রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। এই গ্রন্থ দুটিতে ঐতিহাসিকতা যথাসম্ভব রক্ষা করবার ইচ্ছায় তিনি ১২৯৩ সালের ২৩শে বৈশাখ মহারাজ বীরচন্দ্রকে যে পত্র লেখেন, তার প্রধান অংশটি নিচে উদ্ধৃত হল।

"মহারাজ বোধ করি শুনিয়া থাকিবেন যে, আমি ত্রিপুরা-রাজবংশের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া 'রাজর্ষি' নামক একটি উপন্যাস লিখিতেছি। কিন্তু তাহাতে ইতিহাস রক্ষা করিতে পারি নাই। তাহার কারণ, ইতিহাস পাই নাই। এজন্য আপনাদের কাছে মার্জ্জনা প্রার্থনা বিহিত বিবেচনা করিতেছি। এখন যদিও অনেক বিলম্ব হইয়াছে, তথাপি মহারাজ যদি গোবিন্দমাণিক্য ও তাঁহার ভ্রাতার রাজত্ব সময়ের সবিশেষ ইতিহাস আমাকে প্রেরণ করিতে অনুমতি করেন, তবে আমি যথাসাধ্য পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করি। মহারাজ

উঠুক নিদেন দশ-পঁচিশ টাকাও উঠবে। এইরকম উঠে পড়ে লাগ্‌লে তবে টাকা হয়! তোমরা ত কেবল খরচ কর্তে জান—এক পয়সা ঘরে আন্‌তে পার?"

মজঃফরপুরে বড় মেয়ে ও বড় জামাইকে দেখতে গিয়ে লিখেছিলেন :—

"তোমার মেয়েকে জিজ্ঞাসা কোরো জামাইবাড়ি এসে আমি কি রকম সাজসজ্জায় মনোযোগ করেছি। ঢাকাই ধুতি চাদর ছাড়া আর কথা নেই! এখানকার লোকেরা জানে আমি শরতের শ্বশুর, বঙ্গদর্শনের সম্পাদক, ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষ, জগদ্বিখ্যাত মাননীয় শ্রদ্ধাস্পদ রবি ঠাকুর, আমার বেশভূষা দেখে তাদের চক্ষু স্থির হ'য়ে গেছে। রোজ সন্ধ্যাবেলায় দলে দলে বাঙালীরা এই অদ্ভুত কৌতুক দেখবার জন্যে সমাগত হচ্ছে—শরতের ঘরে আর জায়গা হয় না—মনে করচি ঢাকাইটা ছাড়তে হবে—নইলে লোকের আমদানি বন্ধ করা যাবে না। শরৎ ত ভীড় দেখে ভয় পেয়ে গেছে। তোমার কথা শুনে আমার এই দুর্গতি হ'ল।...আমি তাই মনে স্থির করেছি তোমার বুদ্ধিতে আর চল্‌ব না—আমাদের হিন্দুশাস্ত্রেও লিখ্‌চে স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। বোধহয় শাস্ত্রকারদের স্ত্রীরা স্বামীদের জোর করে ঢাকাই ধুতি পরাত।"

স্বদেশে বিদেশে কবিকে দেখবার জন্যে যত জায়গায় অসম্ভব ভীড় হয়েছে, সর্বত্রই বোধ করি তিনি ঢাকাই ধুতি পরে দর্শন দিতেন বলে!

আর একটি চিঠিতে কবি লিখছেন :—

"তোমাদের ওখেনে শীত নেই? আমাকে ত শীতে ভারি কাঁপিয়ে তুলেছে। কেবল কাল রাত্তিরে কোন্ একটা বন্ধ জায়গায় নৌকো রেখেছিল আর সমস্ত পর্দ্দা ফেলেছিল—তাই গরমে জেগে উঠেছিলুম—তার উপরে আবার কানের কাছে এক দল লোক সেই একটা দুটো রাত্তিরে গান জুড়ে দিলে 'কত নিদ্রা দিবে আর উঠ উঠ প্রাণপ্রিয়ে।' প্রাণপ্রিয়ে যদি কাছাকাছির মধ্যে থাকত তা হ'লে বোধহয় চেলা কাঠের বাড়ি পিটোত। মাঝিরা তাদের ধমকে থামিয়ে দিলে, কিন্তু আমার মাথায় ক্রমাগতই ঐ লাইনটা ঘুরতে লাগল 'উঠ উঠ প্রাণপ্রিয়ে'—"

স্বদেশে বিদেশে বার বার অনেক বার ভ্রমণের জন্যে রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত ছিলেন। তাই তাঁর একবার বিলাতযাত্রার পথে লেখা একটি চিঠিতে এই কথাগুলি পড়ে বেশ মজা লাগ্‌ল :—

"এমন কেউ নেই যাকে সব বলা যায়"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহধর্মিণীর কথা প্রায় কখনও বলতেন না বললেও চলে। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী 'প্রবাসী'তে "সংসারী রবীন্দ্রনাথ" নাম দিয়ে যে প্রবন্ধটি লেখেন, তাতেই বাঙালী পাঠকসমাজ প্রথম কবিজায়ার সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ্ করে। "মংপুতে" শীর্ষক প্রবন্ধাবলীর যে অংশ 'প্রবাসী'র বর্তমান সংখ্যায় বেরিয়েছে তাতে এক জায়গায় (২২৬ পৃষ্ঠায়) কবি-গৃহিণীর প্রসঙ্গ আছে। কবি বলছেন :—

> "তখন অবশ্য তিনি ছিলেন আমার কাজে। এখনকার ছেলেমেয়েদের মত আমরা অত খুঁৎখুঁতে ছিলাম না। আধুনিকভাবে আমাদের বিবাহ হয় নি ত, কিন্তু কিছুই এসে যায় নি তাতে। একটা গভীর শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। তিনি ত চেয়েছিলেন আমার শান্তিনিকেতনের কাজে সঙ্গিনী হতে। বিশেষ করে ইদানীং অর্থাৎ শেষের দিকে তাঁর একান্ত আগ্রহ হয়েছিল কাজ করবার। কিন্তু সে ত হ'ল না, অল্প পরেই তাঁর সেই ভয়ানক অসুখ হল।"
>
> "আপনার খুব অভাব বোধ হয় নি?"
>
> "ঐ যে বললুম, চিরদিন আমি একটা জায়গায় উদাসীন নিরাসক্ত ছিলুম। সেইটেই আমার স্বভাব। ভিতরে ভিতরে দূরে থাকবার একটা অভ্যাস ছিল সব কিছু থেকেই। তাছাড়া, যখন তিনি চলে গেলেন, তখন আমার এক মুহূর্ত্ত অবসর ছিল না। শান্তিনিকেতন সুরু হয়েছে, হাতে পয়সা নেই, ঋণের পর ঋণ বোঝার মত চেপে রয়েছে। কাজের অন্ত নেই। তখন নিজের সুখ-দুঃখকে কেন্দ্র ক'রে মনকে আবদ্ধ করবার অবসরই বা কোথায়? মেজমেয়ে মৃত্যুশয্যায় আলমোড়ায়, তাকে ফেলেও বারে বারে আসতে হ'ত শান্তিনিকেতনের কাজে। যাওয়া আসা ছুটোছুটি চলেছেই। তবে সবচেয়ে কি কষ্ট হ'ত জান, যে এমন কেউ নেই যাকে সব বলা যায়। সংসার কথার পুঞ্জ অনবরত জমে উঠতে থাকে; ঠিক পরামর্শ নেবার জন্য নয়, শুধু বলার জন্যই, এমন কাউকে

হয়ে আসে। যা চেষ্টা করবার তা যত দূর সাধ্য করব—কিন্তু তুমি মনে মনে অসুখী অসন্তুষ্ট হয়ে থেকো না ছুটি। জান ত তাই আমার খুঁৎখুঁতে স্বভাব, আমার নিজেকে ঠাণ্ডা করতে যে কত সময় নির্জনে কত বোঝাতে হয় তা তুমি জান না—তুমি আমার সেই খুঁৎখুঁতে ভাবটা দূর ক'রে দিয়ো, কিন্তু তুমি আবার তাতে যোগ দিয়ো না।"

ছেলেমেয়েদের গান শেখাবার একটা হদিস একখানি চিঠিতে আছে।

"বেলির সঙ্গে খোকা কি গান শিখ্‌বে না? তার গলা কি রকম ফুটবে? কেবল সা রে গা মা না শিখিয়ে তার সঙ্গে একটা কিছু গান ধরানো ভাল—তা হলে ওদের শিখতে ভাল লাগবে—নইলে ক্রমেই বিরক্ত ধরে যাবে। মনে আছে ছেলেবেলায় যখন বিষ্ণুর কাছে গান শিখতুম তখন সা রে গা মা শিখতে ভারি বিরক্ত বোধ হত। যেদিন সে নতুন কোন গান শেখানো ধরাত সেই দিন ভারি খুসি হতুম। তুমিও তোমার পুত্রকন্যাদের সঙ্গে একত্র বসে সা রে গা মা সাধ্‌তে আরম্ভ করে দাও মা। তারপর বর্ষার দিনে আমি যখন ফিরে যাব তখন স্বামী-স্ত্রীতে দুজনে মিলে বাংলায় খুব সঙ্গীতালোচনা করা যাবে। কি বল?"

১৮৯৮ সালের জুন মাসে শিলাইদহ থেকে লেখা একটি চিঠি ভারি সুন্দর। তার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি।

"বৃহৎ শান্তি, উদার বৈরাগ্য, নিঃস্বার্থ প্রীতি, নিষ্কাম কর্ম্ম—এই হল জীবনের সফলতা। যদি তুমি আপনাতে আপনি শান্তি পাও এবং চারদিককে সান্ত্বনা দান করতে পার, তা হলে তোমার জীবন সম্রাজ্ঞীর চেয়ে সার্থক। ভাই ছুটি—মনকে যথেচ্ছা খুঁৎখুঁৎ করতে দিলেই সে আপনাকে আপনি ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে। আমাদের অধিকাংশ দুঃখই স্বেচ্ছাকৃত। আমি তোমাকে বড় বড় কথায় বক্তৃতা দিতে বসেছি বলে তুমি আমার উপর রাগ করো না। তুমি জান না অন্তরের কি সুতীব্র আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আমি একথাগুলি বলচি।"

এর পরই কবি অল্প বয়সের ও বেশি বয়সের দাম্পত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে লিখেছেন :—

"তোমার সঙ্গে আমার প্রীতি, শ্রদ্ধা এবং সহজ সহায়তায় একটি সুদৃঢ় বন্ধন অত্যন্ত নিবিড় হয়ে আসে, যাতে সেই নির্ম্মল শান্তি এবং সুখই সংসারের

সেইরূপ আছে। সব কথাই অবস্থাবিশেষে ঘটনার স্রোতে স্বাভাবিকভাবে এসে পড়েছে।

রক্ষিত ও প্রকাশিত এই ৩৬খানি চিঠির মধ্যে প্রথম চিঠিটি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এবং শেষটি ১৯০১ সালে লেখা। অর্থাৎ চিঠিগুলি কবি তাঁর ২৯/৩০ থেকে ৪০ বৎসর বয়সের মধ্যে লিখেছিলেন।

আমরা বলেছি, কোন কোন চিঠিতে সাধারণ গৃহস্থের শাকবেগুনের কথাও আছে। যেমন শিলাইদহ থেকে লেখা একটি চিঠিতে আছে :—

"তোমার শাকের ক্ষেত ভরে গেছে। কিন্তু ডাঁটা গাছগুলো বড্ড বেশি ঘন ঘন হওয়াতে বাড়তে পারবে না। চালানের সঙ্গে তোমার শাক কিছু পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। কুমড়ো অনেকগুলো পেড়ে রাখা হয়েছে। নীতু যে গোলাপ গাছ পাঠিয়েছিল সেগুলো ফুলে ভরে গেছে কিন্তু অধিকাংশই কাঠগোলাপ—তাকে ভয়ানক ফাঁকি দিয়েছে। রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, মালতী, ঝুমকো, মেদি খুব ফুটছে। হাস্নু-ও-হানা ফুট্‌চে কিন্তু গন্ধ দিচ্চে না, বোধহয় বর্ষাকালে ফুলের গন্ধ থাকে না।"

"পুকুর জলে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। সাম্‌নে আকের ক্ষেত খুব বেড়ে উঠেছে, চতুর্দিকের মাঠ শেষ পর্যন্ত শস্যে পরিপূর্ণ—কোথাও সবুজের বিচ্ছেদ নেই। সবাই জিজ্ঞাসা করচে মা কবে আস্‌বেন? আমরা আসব না শুনে এখানকার আমলারা খুব দমে গিয়েছিল।"

অনেক চিঠির অনেক অংশ হিউমারের স্নিগ্ধ রশ্মিতে উদ্ভাসিত। যেমন নিম্নোদ্ধৃত অংশটি :—

"কুষ্টিয়ায় এসে পৌঁচেছি। পৌঁছে একটা বিষয়ে বড় হতাশ্বাস হয়ে পড়েছি, এখানে শালাকে দেখলুম কিন্তু আমার শালাজটিকে দেখলুম না। তাকে গতকল্য কাশীতে তার মাতৃসন্নিধানে পাঠিয়ে দিয়ে কুষ্টিয়া নগরী অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। তার খাট বিছানা তেমনি পড়ে রয়েছে, আল্‌নায় তার অত্যন্ত ময়লা কাপড় ঝুলছে। কিন্তু সে নেই! হায়!"

কিংবা প্রথম চিঠির এই বাক্যগুলি :—

"দেখ্‌ছ, বসে বসে কত উপার্জনের উপায় করচি। সকালে উঠেই বই লিখতে বসেছি তাতে কত টাকা হবে একবার ভেবে দেখ! ছাপাবার সমস্ত খরচ না

থেকে তোমাদের দূরে নিভৃত পল্লীগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসতে এত উৎসুক হয়েছি—সেখানে কোন মতেই লাভ ক্ষতি আত্মপরকে ভোলবার যো নেই—সেখানে ছোটখাট বিষয়ের দ্বারা সর্ব্বদা ক্ষুব্ধ হয়ে শেষকালে জীবনের উদার উদ্দেশ্যকে সহস্র ভাগে খণ্ডীকৃত করতেই হবে। এখানে অল্পকেই যথেষ্ট মনে হয় এবং মিথ্যাকে সত্য বলে ভ্রম হয় না। এখানে এই প্রতিজ্ঞা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা তত শক্ত নয় যে—

সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বা প্রিয়ং
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতা।"

আমার দেহ যে আমি নই, এই ধারণা দৃঢ় করে যে দুঃসহ দৈহিক যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এবং ঐ ধারণা যে উচ্চ সাধনার ভিত্তি, তার সন্ধান কবির একটি চিঠি থেকে পাওয়া যায়। তিনি লিখছেন—

"একদিন রাত্রে বৈঠকখানায় ঘুমচ্ছিলুম সেই অবস্থায় আমার পায়ে বিছে কামড়ায়—যখন খুব যন্ত্রণা বোধ হচ্ছিল আমি আমার সেই কষ্টকে আমার দেহকে আমার আপনার থেকে বাইরের জিনিষ বলে অনুভব করতে চেষ্টা করলুম—ডাক্তার যেমন অন্য রোগীর রোগযন্ত্রণা দেখে, আমি তেমনি করে আমার পায়ের কষ্ট দেখতে লাগলুম—আশ্চর্য্য ফল হল—শরীরে কষ্ট হতে লাগল অথচ সেটা আমার মনকে এত কম ক্লিষ্ট করলে যে আমি সেই যন্ত্রণা নিয়ে ঘুমতে পারলুম। তার থেকে আমি যেন মুক্তির একটা নতুন পথ পেলুম।

"এখন আমি সুখ-দুঃখকে আমার বাইরের জিনিস এই ক্ষণিক পৃথিবীর জিনিষ বলে অনেক সময় প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে পারি—তার মত শান্তি ও সাধনার উপায় আর নেই। কিন্তু বারম্বার পদে পদে এইটেকে মনে এনে সকল রকমের অসহিষ্ণুতা থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করা চাই—মাঝে মাঝে ব্যর্থ হ'য়েও হতাশ হ'লে হবে না—ক্ষণিক সংসারের দ্বারা অমর আত্মার শান্তিকে কোন মতেই নষ্ট হতে দিতে চলবে না—কারণ এমন লোকসান আর কিছুই নেই—এ যেন দু-পয়সার জন্য লাখ টাকা খোয়ানো। গীতায় আছে—লোকে যাকে উদ্বেজিত করতে পারে না এবং লোককে যে উদ্বেজিত করে না—যে হর্ষ বিষাদ ভয় এবং ক্রোধ থেকে মুক্ত সেই আমার প্রিয়।"

প্রিয়জন থেকে দূরে থাকার দুঃখকে চিঠি সুখে পরিণত করতে পারে।

"দূরে থাকার একটা প্রধান সুখ হচ্ছে চিঠি—দেখাশোনার সুখের চেয়েও তার একটু বিশেষত্ব আছে। জিনিষটি অল্প বলে তার দামও বেশি—দুটো চারটে

"আজকাল কেবল মনে হয় বাড়ির মত এমন জায়গা আর নেই—এবারে বাড়ি ফিরে গিয়ে আর কোথাও নড়ব না।"

পৃথিবীতে যথার্থ সুখী হবার উপায় সম্বন্ধে কবি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন :—

'তোমার কালকের একটা চিঠি পেয়ে আমার মন একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমরা যদি সকল অবস্থাতেই দৃঢ় বলের সঙ্গে সরল পথে সত্য পথে চলি তা হ'লে অন্যের অসাধু ব্যবহারে মনের অশান্তি হবার কোন দরকার নেই—বোধ হয় একটু চেষ্টা করলেই মনটাকে তেমন করে তৈরি ক'রে নেওয়া যেতে পারে। এক্‌লা ব'সে ব'সে সঙ্কল্প করেছি আমি সেই রকম চেষ্টা করব—অবিচলিত ভাবে আপনার কর্তব্য করে যাব—তারপরে যে যা বলে যে যা করে কিছুতেই তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হব না—কতদূর কৃতকার্য হতে পারব জানি নে। প্রতিদিন নিরলস হ'য়ে নিজের সমস্ত কাজগুলি নিজের হাতে সম্পূর্ণরূপে সমাধা করলে এ রকম নিজের প্রতি এবং চারদিকের প্রতি অসন্তোষ জন্মাতে পায় না—যেখানেই পড়া যায় সেখানেই বেশ প্রফুল্ল সন্তুষ্টভাবে আপনার নিত্য কাজ ক'রে কাটানো যেতে পারে। মনে যদি কোন কারণে একটা অসন্তোষ এসে পড়ে সেটাকে যতই পোষণ করবে ততই সে অন্যায় রূপে বেড়ে উঠতে থাকে—সেটা যে কিছুই নয় এইরকম ভাবতে চেষ্টা করা উচিত—তার যতটুকু প্রতিকার করা আমার সাধ্য তা অবশ্য করব— যতটুকু অসাধ্য তা ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছা স্মরণ করে অপরাজিত চিত্তে বহন করবার চেষ্টা করব। পৃথিবীতে এ ছাড়া যথার্থ সুখী হবার আর কোন উপায় নেই!"

এই ধরনের কথা আর একটি চিঠিতে আছে।

"যাই হোক সংসারের সমস্তই ত নিজের সম্পূর্ণ আয়ত্ত নয়। যে অবস্থার মধ্যে অগত্যা থাকতেই হবে তার মধ্যে যতটা পারা যায় প্রাণপণে নিজের কর্তব্য করে যেতে হবে—তারই মধ্যে যতটা ভাল করা যায় তা ছাড়া মানুষ আর কি করতে পারে বল। অসন্তোষকে মনের মধ্যে পালন কোরো না ছোটবৌ—ওতে মন্দ বই ভাল হয় না। প্রফুল্ল মুখে সন্তুষ্ট চিত্তে অথচ একটা দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে সংসারের ভিতর দিয়ে যেতে হবে—আমি নিজে ভারি অসন্তুষ্টস্বভাব, সেই জন্যে আমি অনেক অনর্থক কষ্ট পাই—কিন্তু তোমাদের মনে অনেকখানি প্রফুল্লতা থাকা ভারি আবশ্যক। নইলে সংসার বড় অন্ধকার

না করে সে নিজের ব্রত সাধন করবে ততই সে মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠবে।... ছেলেদের নিজের হাত থেকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করতে চাই—তিনি এদের ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব, ইচ্ছার তেজ, প্রবৃত্তির বেগ, দশের আকর্ষণ অপহরণ করে মঙ্গলের ভাবে এবং সুকঠিন বীর্য্যে ভূষিত করে তুলুন। এই আমার কামনা—আমরা আমাদের সমুদয় উচ্ছৃঙ্খল ইচ্ছাকে কঠিনভাবে সংযত করে ঈশ্বরের নিগূঢ় ধর্ম্মনিয়মের যেন সহায়তা করি—পদে পদেই যেন তাকে প্রতিহত করে আপনার অভিমানকেই অহোরাত্রি জয়ী করবার চেষ্টা না করি।"

১৯০১ সালেই শিলাইদহ থেকে লেখা একটি চিঠিতে আছে :—

"আমি এখন সংসারকে এত মরীচিকার মত দেখি যে, কোন খেদের কথা মনে উঠলে পদ্মপাত্রে জলের মত শীঘ্রই গড়িয়ে যায়—আমি মনে মনে ভাবি আর একশো বৎসর না যেতেই আমাদের সুখদুঃখ এবং আত্মীয়তার সমস্ত ইতিবৃত্ত কোথায় মিলিয়ে যাবে—তাছাড়া অনন্ত নক্ষত্রলোকের দিকে যখন তাকাই এবং এই অনন্ত লোকের নীরব সাক্ষী যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর দিকে মনকে মুখোমুখি স্থাপন করি তখন মাকড়সার জালের মত ক্ষণিক সুখদুঃখের সমস্ত ক্ষুদ্রতা কোথায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে মিলিয়ে যায়, দেখতেও পাওয়া যায় না।"

শান্তিনিকেতন কেন যে কবির এত প্রিয় ছিল, ১৯০১ সালের জুলাই মাসে লেখা একখানি চিঠির নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি থেকে তার আভাস পাওয়া যায়।

"আজ শান্তিনিকেতনে এসে শান্তিসাগরে নিমগ্ন হয়েছি। মাঝে মাঝে এ রকম আসা যে কত দরকার তা না এলে দূর থেকে কল্পনা করা যায় না। আমি একলা অনন্ত আকাশ বাতাস এবং আলোকের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যেন আদিজননীর কোলে স্তনপান করচি।"

কবির ব্যক্তিগত দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শের আভাস অনেক চিঠিতে পাই। সে সম্বন্ধে দুখানি চিঠি থেকে কিছু উদ্ধৃত ক'রে এই প্রবন্ধ শেষ করি।

"জীবনে দুজনে মিলে সকল বিষয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে অগ্রসর হওয়া সহজ হয়—তোমাকে কোন বিষয়ে আমি ছাড়িয়ে যেতে ইচ্ছা করি নে—কিন্তু

আর সকলের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে, যাতে তার কাছে প্রতিদিনের সমস্ত দুঃখ নৈরাশ্য ক্ষুদ্র হয়ে যায়—আজকাল এই আমার চোখের কাছে একটা প্রলোভনের মত জাগ্রত হয়ে আছে।

"স্ত্রী-পুরুষের অল্পবয়সের প্রণয়মোহে একটা উচ্ছ্বসিত মত্ততা আছে, কিন্তু এ বোধহয় তুমি তোমার নিজের জীবনের থেকেও অনুভব করতে পারচ—বেশি বয়সেই বিচিত্র বৃহৎ সংসারের তরঙ্গদোলার মধ্যেই স্ত্রী-পুরুষের যথার্থ স্থায়ী গভীর সংযত নিঃশব্দ প্রীতির লীলা আরম্ভ হয়—নিজের সংসার বৃদ্ধির সঙ্গে বাইরের জগৎ ক্রমেই বেশি বাইরে চলে যায়—সেই জন্যেই সংসার বৃদ্ধি হলে এক হিসাবে সংসারের নির্জ্জনতা বেড়ে ওঠে এবং ঘনিষ্ঠতার বন্ধনগুলি চারদিক থেকে দুজনকে জড়িয়ে আনে। মানুষের আত্মার চেয়ে সুন্দর আর কিছুই নেই, যখনি যাকে খুব কাছে নিয়ে এসে দেখা যায়, যখনি তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ মুখোমুখি পরিচয় হয়, তখনি যথার্থ ভালবাসার প্রথম সূত্রপাত হয়। তখন কোন মোহ থাকে না, কেউ কাউকে দেবতা বলে মনে করবার দরকার হয় না, মিলনে ও বিচ্ছেদে মত্ততার ঝড় বয়ে যায় না—কিন্তু দূরে নিকটে সম্পদে বিপদে অভাবে এবং ঐশ্বর্য্যে একটি নিঃসংশয় নির্ভরের একটি সহজ আনন্দের নির্ম্মল আলোক পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে।"

এরপর কবি তাঁদের দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে তাঁর হৃদয়গত আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছেন :—

"আমি জানি তুমি আমার জন্যে অনেক দুঃখ পেয়েছ, এও নিশ্চয় জানি যে আমারই জন্য দুঃখ পেয়েছ বলে হয়ত একদিন তুমি তার থেকে একটি উদার আনন্দ পাবে। ভালবাসার মার্জ্জনা এবং দুঃখ-স্বীকারে যে সুখ, ইচ্ছাপূরণ ও আত্মতৃপ্তিতে সে সুখ নেই।

"আজ কাল আমার মনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এই, আমাদের জীবন সহজ এবং সরল হোক, আমাদের চতুর্দ্দিক প্রশান্ত ও প্রসন্ন হোক, আমাদের সংসারযাত্রা আড়ম্বরশূন্য এবং কল্যাণপূর্ণ হোক, আমাদের অভাব অল্প উদ্দেশ্য উচ্চ চেষ্টা নিঃস্বার্থ এবং দেশের কার্য্য আপনাদের কাজের চেয়ে প্রধান হোক—এবং যদি বা ছেলেমেয়েরাও আমাদের এই আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ক্রমশঃ দূরে চলে যায় আমরা দুজনে শেষ পর্য্যন্ত পরস্পরের মনুষ্যত্বের সহায় এবং সংসারক্লান্ত হৃদয়ের একান্ত নির্ভরস্থল হয়ে জীবনকে সুন্দরভাবে অবসান করতে পারি। সেই জন্যেই আমি কলকাতার স্বার্থদেবতার পাষাণমন্দির

রবীন্দ্রনাথের "চিঠিপত্র" দ্বিতীয় পুস্তক

রবীন্দ্রনাথের যে-সব চিঠি বিশ্বভারতী সম্প্রতি "চিঠিপত্র" নাম দিয়ে পুস্তকের আকারে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছেন, তার প্রথম পুস্তকটিতে তাঁর সহধর্মিণীকে লেখা ৩৬টি চিঠি ছিল। তার পরিচয় আমরা আগে দিয়েছি। গত (শ্রাবণ) মাসে "চিঠিপত্র" নামের দ্বিতীয় পুস্তক বের হয়েছে। এতে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা পঞ্চাশটি চিঠি আছে। কবির অন্যান্য চিঠির মত এই চিঠিগুলি থেকেও তাঁর ব্যক্তিত্বের এবং নানাবিষয়ক আদর্শ ও মতের পরিচয় পাওয়া যায়। পুত্রকে কবি কোন কোন চিঠিতে যে-সব উপদেশ দিয়েছেন সেগুলি ব্যক্তিগত হ'লেও অন্যদের পক্ষেও শিক্ষাপ্রদ। "চিঠিপত্র" দ্বিতীয় পুস্তকের প্রথম চিঠিটি হ'তে এইরকম শিক্ষাপ্রদ কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করছি।

> আশা করি তোর পড়াশুনা বেশ ভালই চলিতেছে এবং তুই সর্ব্বপ্রকার নিয়ম পালন পূর্ব্বক সংযতভাবে অধ্যয়নে নিযুক্ত আছিস। কি নিয়মে ও কিরূপ ভাবে তোর চলিতেছে এখনো তাহার কোন সংবাদ পাই নাই। আমার ইচ্ছা তুই দিবারাত্রি বিদ্যালয়েই থাকিস। শান্তিনিকেতনের বাড়ীতে তোর যাতায়াত থাকিলে মন বিক্ষিপ্ত হইবে। তুই বিদ্যালয়ের ছাত্র একথা কিছুতেই বিস্মৃত হইবি না। সম্মুখে আপাতত কোন পরীক্ষা দিবার উত্তেজনা নাই বলিয়া যদি স্বাধীন ভাবে চলিস্ ও শিথিলভাবে পড়াশুনা করিস্ তবে নিজের পরম ক্ষতি করিবি। এত দিন যেমন ভাবে নিয়ত পাঠাভ্যাস করিয়াছিস্ তেমনি ভাবেই করিতেই হইবে।...
>
> স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আপনার উন্নতি সাধন ও সকল প্রকার মন্দ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবার বয়স তোর হইয়াছে এখন নিজের ভার তুই নিজে গ্রহণ করিবি এই আমি দেখিতে ইচ্ছা করি। আমার এখন সকল দিক হইতে অবকাশ লইবার সময় হইয়াছে—আমার সংসারের মঙ্গল এখন তোর উপরেই প্রধানত নির্ভর করিবে। তোর দৃষ্টান্তও শিক্ষা, তোর চরিত্রবল ও

কথাকে সম্পূর্ণ হাতে পাওয়া যায়; তাকে ধরে রাখা যায়, তার মধ্যে যতটুকু যা আছে সেটা নিঃশেষ করে পাওয়া যেতে পারে। দেখাশোনার অনেক কথাবার্তা ভেসে চলে যায়—যত খুসি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলেই তার প্রত্যেক কথাটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করা যায় না; বাস্তবিক মানুষে মানুষে দেখাশোনার পরিচয় থেকে চিঠির পরিচয় একটু স্বতন্ত্র—তার মধ্যে এক রকমের নিবিড়তা গভীরতা একপ্রকার বিশেষ আনন্দ আছে। তোমার কি তাই মনে হয় না?"

ছেলেদের জন্যে উদ্বেগের কথা কয়েকটি চিঠিতেই আছে। সন্তানেরা মনের মত হয়, কোন্ বাপ-মা তা না চান? কিন্তু উদ্বেগ বৃথা।

"ছেলেদের জন্যে সর্বদা আমার মনের মধ্যে যে একটা উদ্বেগ থাকে সেটা আমি তাড়াবার চেষ্টা করি। ওরা যাতে ভাল হয় ভাল শিক্ষা পায় আমাদের সাধ্যানুসারে সেটা করা উচিত, কিন্তু তাই নিয়ে মনকে উৎকণ্ঠিত করে রাখা ভুল। ওরা ভাল মন্দ মাঝারি নানা রকমের হ'য়ে আপন আপন জীবনের কাজ করে যাবে—ওরা আমাদের সন্তান বটে তবু ওরা স্বতন্ত্র—ওদের সুখ-দুঃখ পাপপুণ্য কাজকর্ম্ম নিয়ে যে পথে অনন্তকাল ধরে চলে যাবে সে পথের উপর আমাদের কোন কর্ত্তৃত্ব নেই—আমরা কেবল কর্ত্তব্য পালন করব কিন্তু তার ফলের জন্যে কাতর ভাবে সস্পৃহ ভাবে অপেক্ষা করব না,—ওরা যে রকম মানুষ হ'য়ে দাঁড়াবে সে ঈশ্বরের হাতে—আমরা সে জন্য মনে মনে কোন রকম অতিরিক্ত আশা রাখব না। আমার ছেলের উপর আমার যে মমতা, এবং সে সব চেয়ে ভাল হবে বলে আমার যে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা সেটা অনেকটা অহঙ্কার থেকে হয়। আমার ছেলের সম্বন্ধে বেশি করে প্রত্যাশা করবার কোন অধিকার আমাদের নেই। কত লোকের ছেলে যে কত মন্দ অবস্থায় পড়ে, আমরা তার জন্যে কতটুকুই বা ব্যথিত হই?..."

এইরকম কথা কবি ১৮৯৯ সালে লিখেছিলেন। ১৯০১ সালে তিনি শিলাইদহ ত্যাগ করে সপরিবারে শান্তিনিকেতনে আসেন। তখন সেখানে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়ে কাজ চলছে। এই সময় তিনি শিলাইদহ থেকে সহধর্মিণীকে যে চিঠিখানি লেখেন, প্রকাশিত চিঠিগুলির মধ্যে সেইটি শেষ চিঠি। তাতে শিলাইদহ ছেড়ে যেতে হবে ব'লে মনের ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন। শেষ প্যারাগ্রাফে তিনি লিখছেন :—

"রথীকে আমি উচ্চতর জীবনের জন্য প্রস্তুত করতে চাই—সুতরাং নিয়ম সংযম এবং কৃচ্ছ্র সাধন করতেই হবে—যতই দৃঢ়তার সঙ্গে লেশমাত্র লঙ্ঘন

হবে না। দু-চারজন ক'রে জেলে যেতে যেতে ওটা অভ্যাস হয়ে যাবে—বিশেষ কিছু মনেই হবে না। যেমন আমাদের ম্যালেরিয়া আছে—মাঝে মাঝে ভুগচি, মাঝে মাঝে সারচে, মাঝে মাঝে মরচিও—জেলখাটাও আমাদের ভদ্রসমাজের তেমনি একটা নিত্যনৈমিত্তিক অনিবার্য্য আধিব্যাধির মধ্যে গণ্য হয়ে উঠ্‌বে।

বাংলা দেশে বাঙালীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য কোম্পানি খোলা সম্বন্ধে কবির মতের এখনও মূল্য আছে—যদিও এখন অনেক বাঙালী আগেকার চেয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

আমাদের দেশে অনেক বড় বড় কোম্পানি খোলা হয়েছে কোনোটাই সুবিধাজনক হয় নি। তার প্রধান কারণ, যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্বস্ত লোক পাওয়া যায় না। আমরা যে কোনো কাজই করি না কেন, তাতে যতই টাকা ঢালি এবং ব্যবস্থা যতই পাকা হোক উপযুক্ত লোক কোনোমতেই পাই নে। এই জন্যে গোড়ায় অল্পস্বল্প পরিমাণে কাজ আরম্ভ করায় সুবিধা এই যে, প্রথমেই বেশি লোকের দরকার হয় না, আগাগোড়া সমস্ত কাজই স্বচক্ষে দেখবার অবকাশ পাওয়া যায় এবং ক্রমে ক্রমে লোক তৈরি করে তোলা যায়। সকল কাজেরই গোড়ার দিকে অনেকটা সময় পরীক্ষায় ব্যয় করতে হয়—কাজের সমস্ত আটঘাট বুঝে নিতে ও বেঁধে নিতে প্রথমটা কিছুকাল লাগেই—যে সব দেশে টাকা সচ্ছল তারা দু-দশ বৎসর বসে থেকে বা লোকসান দিয়েও ক্রমে যদি তিন-চার পার্সেন্ট মুনফা দেখাতে পারে তাহলে ঠাণ্ডা থাকে—কিন্তু আমাদের দেশে কারো সবুর সইবে না—যেদিন টাকা ফেল্‌বে তার পরদিনেই লাভের জন্যে হাত পাতবে—কিছুদিন যদি মুনফা বন্ধ থাকে তাহলে নানাপ্রকার সন্দেহ জন্মাতে থাকবে, লোক বদলাতে চাইবে, নানা উৎপাত করবে। যারা বেশি টাকা শেয়ার নেয়, তারা সর্ব্বদাই কাজের মধ্যে হস্তক্ষেপ করতে চায়। এই রকমে ইস্কুল থেকে আরম্ভ করে ব্যবসা পর্য্যন্ত কোনো কাজ আমাদের সুশৃঙ্খলে হবার যো নেই।...

এখন আমার মনে আর সন্দেহমাত্র নেই যে, আমাদের দেশে যদি কোনো কাজকে সফল করতে হয় তবে একলা ছোটরকম করে আরম্ভ করে লোকচক্ষুর অগোচরে তাকে ধীরে ধীরে মানুষ করে তোলাই তার প্রকৃষ্ট উপায়। সেইটেই স্বাভাবিক পন্থা। বিশেষত যাদের অর্থাভাবে কৃপণের মতই কাজ করতে হবে—যাদের কার্য্যশিক্ষার ক্ষতি বহন করবারও ক্ষমতা নেই।...

জোর করে তোমাকে পীড়ন করতে আমার শঙ্কা হয়। সকলেরই স্বতন্ত্র রুচি অনুরাগ এবং অধিকারের বিষয় আছে—আমার ইচ্ছা ও অনুরাগের সঙ্গে তোমার সমস্ত প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ মেলাবার ক্ষমতা তোমার নাই—সুতরাং সে বিষয়ে কিছুমাত্র খুঁৎখুঁৎ না করে ভালবাসার দ্বারা যত্নের দ্বারা আমার জীবনকে মধুর—আমাকে অনাবশ্যক দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করলে সে চেষ্টা আমার পক্ষে বহুমূল্য হবে।"

"আমার ইচ্ছে কোন কথাটি না কয়ে সমস্ত কাজ নিঃশব্দে নিয়মমত হয়ে যায়—আয়োজন বেশি না হয় অথচ সমস্ত বেশ সহজে পরিপাটি পরিচ্ছন্ন এবং সুসম্পন্ন হয়—বেশ নিয়মে চলে অথচ অল্পে চলে ও নিঃশব্দে চলে।"...

"...কোন রকম করে জীবনযাত্রাকে অত্যন্ত সরল করে না আনতে পারলে জীবনে যথার্থ সুখের স্থান পাওয়া যায় না—জিনিষপত্রে গোলেমালে হাঙ্গাম-হুজ্জুতে হিসেবপত্রেই সুখসন্তোষের সমস্ত জায়গা নিঃশেষে অধিকার করে বসে—আরামের চেষ্টাতেই আরাম নষ্ট করে দেয়। বহির্ব্যাপারের চেষ্টাকে লঘু করে দিয়ে মানসিক ব্যাপারের চেষ্টাকে কঠিন করে তোলাই মনুষ্যত্বের সাধনা। ছোটখাট ব্যাপারেই জীবনকে ভারগ্রস্ত করে ফেললে বড় বড় ব্যাপারকে ছেঁটে ফেলতে হয়, সামান্য জিনিষেই সংসারের পথ জটিল হয়ে ওঠে এবং সকলের সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়।" *

উৎস : *প্রবাসী*, আষাঢ়, ১৩৪৯, পৃ. ২৯৫-২৯৮।

* "চিঠিপত্র"—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম খণ্ড। প্রথম সংস্করণ, ২৪শে বৈশাখ, ১৩৪৯। মূল্য এক টাকা। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এখন আমার পরিবারকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিবে। ভালমন্দের আদর্শ তোর নিজের মনের মধ্যে সুদৃঢ় করিয়া রাখিস্—অন্য লোকে কি বলে কি করে তাহাতে যেন তোকে বিক্ষিপ্ত না করিয়া দেয়। এখনকার বাবুয়ানার বিলাসিতার ধনাভিমানের মোহ তোকে যেন স্পর্শ না করে। তোর জীবনযাত্রা যেন বেশ সাদাসিধা হয়—রাজবাড়ীতেই তোর নিমন্ত্রণ থাকুক আর দীনদরিদ্রের কুটীরেই তুই পদার্পণ করিস্ সর্ব্বত্রই বিনা আড়ম্বরে যাইতে তোর যেন লজ্জাবোধ না হয়। বাহিরে বিরলতা ও অন্তরে পরিপূর্ণতা ভারতবর্ষের আদর্শ—সেই আদর্শ তোকে গ্রহণ করিতে হইবে।

নিজেকে হাল্‌কা করিস না—যাহা-তাহা ও যে-সে তোকে যেন বিচলিত না করে যখন যাহার কাছে থাকিস্ তখন তাহারই মত হোসনে—তোর নিজের মধ্যে নিজের যেন একটা প্রতিষ্ঠা থাকে।

এ পর্য্যন্ত নানাভাবে আমাদের পরিবারে মহত্ত্বের আদর্শ বিরাজ করিয়া আসিতেছিল আমাদের বাড়ীর এখনকার ছেলেদের মধ্যে তাহা নষ্ট হইবার দিকে যাইতেছে। আমাদের পারিবারিক মর্য্যাদা বহন করিবার উপযুক্ত ছেলে এখন আর দেখি না—... স্বদেশকে মহৎ ভাবে দীক্ষিত করিবার ইচ্ছা, চেষ্টা, শিক্ষা বা ক্ষমতা কাহারো দেখি নে। আমাদের পরিবারকে এই অধোগতি হইতে রক্ষা করিতে হইবে। অতএব এখনকার দলে না মিশিয়া গিয়া মহৎ লক্ষ্য হৃদয়ে রাখিয়া আপনাকে মহৎ ভার গ্রহণের সর্ব্বপ্রকারে উপযুক্ত করিতে হইবে। তাহার জন্য শিক্ষা চাই, চেষ্টা চাই, সংযম চাই, ত্যাগ স্বীকার চাই—বাহিরের সংসর্গে দৃষ্টান্তে অবিচলিত থাকিয়া অধ্যবসায়ী হওয়া চাই। আমাদের দেশ মহৎ, তুই যে পরিবারে জন্মিয়াছিস্, সেও মহৎ, আমাদের ঋষি পিতামহগণ মহৎ এই কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া নিজেকে যোগ্য করিবার চেষ্টা করিস্—ঈশ্বর তোর সহায় হইবেন। ইতি তা জ্যৈঃ।

দেশের কাজ করতে গিয়ে জেলে যাওয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত একটি চিঠিতে ব্যক্ত হয়েছে।

Statesman কাগজের চাঁদা ফুরলেই আর পাঠাব না। এখন থেকে 'বন্দেমাতরম্' কাগজ পাঠাতে থাক্‌ব। ওটা খুব ভাল কাগজ হয়েচে। কিন্তু অরবিন্দকে যদি জেলে দেয় তাহলে ও কাগজের কি দশা হবে জানি নে। বোধহয় জেল থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে না। আমাদের দেশে জেল খাটাই মনুষ্যত্বের পরিচয় স্বরূপ হয়ে উঠ্‌চে। জেলখানার ভয় না ঘোচাতে পারলে আমাদের কাপুরুষতা দূর

অল্প আরম্ভ থেকে ক্রমে ক্রমে একটা কাজকে নিজের চেষ্টায় গড়ে তোলাতেই যথার্থ শিক্ষা আছে। প্রথমেই অনেক টাকা মূলধন নিয়ে তার রীতিমত মুনফা জোগাতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হতে হবে—ভারতবর্ষের অবস্থা শিখে নিতে যে সময় লাগ্‌বে সে সময়টা বড় মূলধন ত বসে থাক্‌তে চাইবে না।

চাষাবাদের কোন কোন 'কুটীর-শিল্প' শেখাবার কথা তিনি ত্রিশ বৎসরেরও আগে ভাবতেন।

তারপরে এখানে চাষাদের কোন্ industry শেখানো যেতে পারে সেই কথা ভাবছিলুম। এখানে ধান ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না—গ্রহের থাকবার মধ্যে কেবল শক্ত এঁটেল মাটি আছে। আমি জান্‌তে চাই Pottory জিনিষটাকে Cottage industry রূপে গণ্য করা চলে কি না। একবার খবর নিয়ে দেখিস—অর্থাৎ ছোটখাটো furnace আনিয়ে এক গ্রামের লোক মিলে এ কাজ চালানো সম্ভবপর কিনা। মুসলমানরা যে রকম সানকির জিনিষ ব্যবহার করে এরা যদি সেই রকম মোটা গোছের প্লেট বাটি প্রভৃতি তৈরি করতে পারে তাহলে উপকার হয়।

আরেকটা জিনিষ আছে ছাতা তৈরি করতে শেখানো। সে রকম শেখাবার লোক যদি পাওয়া যায় তাহলে শিলাইদহ অঞ্চলে এই কাজটা চালানো যেতে পারে।

নগেন্দ্র বল্‌ছিল খোলা তৈরি করতে পারে এমন কুমোর এখানে আন্‌তে পারলে বিস্তর উপকার হয়। লোকে টিনের ছাদ দিতে চায় পেরে ওঠে না—খোলা পেলে সুবিধা হয়।

যাই হোক ধানভানা কল, Pottoryর চাক ও ছাতা তৈরির শিক্ষকের খবর নিস্—ভুলিস্ নে।

দেওঘরে জমি নিয়ে সেখানে তাঁর "রুগ্ন ছাত্রদের একটা বায়ু পরিবর্ত্তনের জায়গা" করবার ইচ্ছা কবির এক সময়ে হয়েছিল।

জাপান থেকে একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন :—

এখানে সবাই বলচে আমি আসাতে এবং আমার কথাবার্ত্তা ও বক্তৃতায় জাপানে একটা নতুন স্রোত বইবে। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষরা সেই আশা করচেন। আমার বক্তৃতায় সকলেই খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেচে। এখানকার আর্ট স্কুলে মুখে মুখে আর্ট সম্বন্ধে একটা বলেছিলুম। সেই তোদের

পাঠাচ্চি। প্রমথকে দিস্ সবুজপত্রে যেন তর্জ্জমা করে ছাপায়। এবং ইংরেজীটা Modern Review-তে যেন ছাপাস্ নে। ওটা বড় করে বক্তৃতা লিখব।

জাপান থেকে লেখা আর একটি চিঠিতে তিনি নববঙ্গের চিত্রকলা সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন আমাদের চিত্রশিল্পীদের এখনও তাতে মন দেওয়া আবশ্যক।

> আমাদের নববঙ্গের চিত্রকলায় আর একটু জোর, সাহস এবং বৃহত্ত্ব দরকার আছে এই কথা বরাবর আমার মনে হয়েচে। আমরা অত্যন্ত বেশি ছোটখাটোর দিকে ঝোঁক দিয়েছি। টাইকান, শিমোমুরার ছবি একদিকে খুব বড় আয়তনের, আর একদিকে খুব সুস্পষ্ট। কিছুমাত্র আশপাশের বাজে জিনিষ নেই। চিত্রকরের মাথায় যে আইডিয়াটা সকলের চেয়ে পরিস্ফুট কেবলমাত্র সেইটেকেই খুব জোরের সঙ্গে পটের উপর ফলিয়ে তোলা। সমস্ত মন দিয়ে এ ছবি না দেখে থাকবার জো নেই; কোথাও কিছুমাত্র লুকোচুরি ঝাপ্সা কিম্বা পাঁচমিশেলি রংচং দেখা যায় না। ধবধবে প্রকাণ্ড সাদা পটের উপর অনেকখানি ফাঁকা, তার মধ্যে ছবিটি ভারি জোরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকে। নন্দলাল যদি আসত তাহলে এখানকার এই দিকটা বুঝে নিতে পারত। ওদের কারো এখানে আসার খুবই দরকার আছে, নইলে আমাদের আর্ট একটু কুণো রকমের হবার আশঙ্কা আছে। গগন অবনরা ত কোথাও নড়বে না কিন্তু নন্দলালের কি আসবার সম্ভাবনা নেই?

ঐ চিঠিতে জাপানী মেয়েদের সম্বন্ধে এবং "খুব ভালো রকম একটি মেয়ে স্কুল" খোলা সম্বন্ধে কিছু কথা আছে।

> তিন চারদিনের জন্য এখানে একটি মেয়ে ইস্কুলের আতিথ্য ভোগ করে এসেচি। আমাদের সকলেরই খুব ভাল লেগেচে। জাপানী মেয়েদের উপর আমার ভক্তি বেড়ে গিয়েচে। আমি ত এদের মত এমন মেয়ে কোথাও দেখি নি। আমার ভারি ইচ্ছে হচ্চে এবার দেশে ফিরে গিয়ে সুরুলের বাড়ীতে খুব ভালো রকম একটি মেয়ে স্কুল খুলব। আমেরিকায় বই বিক্রি করে যদি যথেষ্ট টাকা পাই এবং যদি আবার দেশে ফিরি তাহলে এই আমার কাজ হবে।

আমেরিকা থেকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলছেন :—

> বক্তৃতার ঝড়ের মুখে সহর থেকে সহরে ঘুরে বেড়াচ্চি। আমার agent দুই পুরুষে এই কাজে নিযুক্ত—সে বলে, এত লোককে দিয়ে তারা বক্তৃতা

> করিয়েছে কিন্তু কখনো এমন লোকের ভিড় ওরা দেখে নি। জায়গায় অভাবে লোক ফিরে ফিরে যাচ্চে। আমার বোধ হচ্চে ঠিক সময়ে বিধাতা আমাকে এখানে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। বিশেষত ছাত্রদের মধ্যে আমার আইডিয়া গভীর ভাবে কাজ করবে বলে বোধ হচ্চে। তাদের উৎসাহ দেখলে আমার আনন্দ হয়।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের এই চিঠিতে বিশ্বভারতীর প্রধান আদর্শের কথা রয়েছে :—

> আমার পক্ষে এই ঘুরপাক নিতান্তই ক্লেশকর। সমস্ত সহ্য করচি এই মনে করে যে, বিধাতার বাণী এদের কাছে বহন করবার আদেশ আমার উপরে আছে। তারপরে এও আমার মনে আছে যে, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে—ঐখানে সার্ব্বজাতিক মনুষ্যত্ব চর্চ্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে—স্বাজাতিক সঙ্কীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আস্‌চে—ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্চে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে। ঐ জায়গাটিকে সমস্ত জাতিগত ভুগোল বৃত্তান্তের অতীত করে তুলব এই আমার মনে আছে—সর্ব্বমানবের প্রথম জয়ধ্বজা ঐখানে রোপণ হবে। পৃথিবী থেকে স্বাদেশিক অভিমানের নাগপাশ বন্ধন ছিন্ন করাই আমার শেষ বয়সের কাজ। এইজন্যেই বিধাতা কোনো খবর না দিয়ে হঠাৎ এই পশ্চিমের ঘাটে আমার নৌকো এনে ভিড়িয়েছেন আমার জীবনের এই অনপেক্ষিত ঘটনার মধ্যে তাঁর যে অভিপ্রায় আছে সে আমাকে গ্রহণ করতে হবে।

"প্রবাসী"র প্রথম বৎসরের প্রথম সংখ্যায় তিনি একটি কবিতায় লিখেছিলেন, "দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া।" এই মর্ম্মের বাণী আমেরিকা হ'তে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে আছে। সেই বাণীর কিছু অংশ, সমস্তটি নয়, উদ্ধৃত করছি। সমগ্র বাণীটিই সকলের পঠনীয়।

> আমার বাণীর পথ রোধ করবে এমন সাধ্য কারো নেই। সমস্ত পৃথিবীকে আমি আমার দেশ বলে বরণ করে নিয়েচি। এরাও ত সকলে আমাকে গ্রহণ করেচে—বরঞ্চ আমার নিজের দেশের লোকের চেয়ে এরা আমাকে বেশি করে আপন লোক বলে জেনেচে। পৃথিবী থেকে যাবার আগে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমার আপন সম্বন্ধ অনুভব ও স্বীকার করে যেতে পারলুম এইটেতেই

আমি আমার জীবন সার্থক বলে জানচি। আমাদের বাংলাদেশের কোণে একটা বিশ্বপৃথিবীর হাওয়া উঠেচে এইটে আমাদের সকলের অনুভব করা উচিৎ। এইখানে রামমোহন রায় সর্ব্বজনীন ধর্ম্মের আলোকে জাগ্রত হয়ে উঠেছিলেন—সেই প্রভাতের আলোকেই বাংলাদেশের নবজাগরণের প্রথম ঊষালোক। সেই আলোকে যে বিশ্বের সুর বেজেচে সেই সুরই আমাদের সুর—সেই সুরই মানব ইতিহাসের আসন্ন ভাবিযুগের সুর।

একদিন চৈতন্য আমাদের বৈষ্ণব করেছিলেন সেই বৈষ্ণবের জাত নেই কুল নেই—আর একদিন রামমোহন রায় আমাদের ব্রহ্মালোকে উদ্বোধিত করেচেন—সেই ব্রহ্মালোকেও জাত নেই দেশ নেই। বাংলা দেশের চিত্ত সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে প্রসারিত হোক্, বাংলাদেশের বাণী সর্ব্বজাতি সর্ব্বমানবের বাণী হোক্। আমাদের বন্দেমাতরং মন্ত্র বাংলাদেশের বন্দনার মন্ত্র নয়—এ হচ্চে বিশ্বমাতার বন্দনা—সেই বন্দনার গান আজ যদি আমরা প্রথম উচ্চারণ করি তবে আগামী ভাবী যুগে একে একে সমস্ত দেশে এই মন্ত্র ধ্বনিত হয়ে উঠবে।

ভৃত্যদের প্রতি তাঁর মনের ভাব ও তাদের প্রতি আমাদের কত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, তা তাঁর এই দীর্ঘ চিঠিটির এক জায়গায় আছে।

উমাচরণ বাঁচবে না আমি জানতুম তবু তার মৃত্যুর খবর পেয়ে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। ছোটবেলা থেকে ও আমাদের কাছে মানুষ হয়ে এসেচে, ওর জীবন আমার জীবনের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। আমার সেবা ওর পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়ে এসেছিল। আমাদের জীবনের দৈনিক তুচ্ছ ভারগুলি যারা বহন করে তারা আমাদের বোঝা কত হাল্‌কা করে দেয় তা তাদের অভাবে খুব স্পষ্ট বুঝতে পারি। এবার দেশে ফিরে গেলে উমাচরণের অভাবে আমার জীবনযাত্রা কত দুরূহ হবে তা বেশ কল্পনা করতে পারচি। আমার নিজের প্রয়োজন যৎসামান্য কিন্তু সেই জন্যেই সেই প্রয়োজনগুলি সুসম্পন্ন না হলে জীবনের কল বিগ্‌ড়ে যায়। আমার কাছে কোনো অতিথি অভ্যাগত এলে উমাচরণের উপর ভার দিয়ে আমি খুব নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারতুম—ও তাদের খাইয়ে দাইয়ে হেসে গল্প করে খুসি করে দিতে পারত। তা ছাড়া ও যতই দোষ অপরাধ করুক আমাকে অন্তরের সঙ্গে যত্ন করত। এই মমতা জিনিষটি ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত হয়, নতুন চাকর যতই কাজের হোক্ এই জিনিষটি তার কাছ থেকে পাব না। মাইনে দিয়ে কাজ পাওয়া যায় সেবা পাওয়া যায় না। যাক একরকম করে চলে যাবে।...

শান্তিনিকেতনে সমস্ত ভারতের প্রতিষ্ঠান তিনি করতে চেয়েছিলেন এবং যথাসাধ্য করেওছিলেন।

> এখন আমরা বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। শান্তিনিকেতন আজ সমস্ত ভারতের সামনে এসে পড়ল—এখন এর মধ্যে কিছুই এমন রাখা চলবে না, যা কুণো, —যাতে সমস্ত ভারতের মন পাওয়া যায় এমন একটি জিনিষ গড়ে তুলতেই হবে।

চীনদেশ থেকে লেখা একটি চিঠিতে সে দেশে একজন ভাল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত পাঠাবার কথা এবং সেই সঙ্গে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর নামের উল্লেখ আছে।

> এখানে খুব আদর যত্ন পাওয়া যাচ্চে। বেশ মনে হচ্চে এদের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হবে। শাস্ত্রীমশায়কে এখানে পাঠাবার দরকার আছে। আমাদের প্রস্তাব শুনে এরা ভারি খুসি হয়েচে। ওরাও এখান থেকে অধ্যাপক পাঠাতে সম্মত আছে। তাহলে বিশ্বভারতীতে চীনীয় ভাষা শেখাবার সুব্যবস্থা হবে। চীনীয় থেকে হারানো সংস্কৃত বইয়ের তর্জ্জমারও সুবিধা হতে পারবে। এ সম্বন্ধে বীরলা ভ্রাতাদের সঙ্গে এখন থেকে আলাপ সুরু করিস্। শাস্ত্রীমশায় ছাড়া আর কারো দ্বারা কাজ হবে না। পীকিনে একজন খুব সংস্কৃত অভিজ্ঞ রাশিয়ান পণ্ডিত আছেন। আমাদের ওখান থেকে কোনো বাজে লোক এলে ধরা পড়বে। এই রুশীয় অধ্যাপক ওদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত অধ্যাপনা করেন।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিচিনাপল্লি হ'তে লেখা একটি চিঠির নিম্নমুদ্রিত অংশ এখনও অনুধাবনযোগ্য।

> শান্তিনিকেতনের প্রতি দেশের দৃষ্টি যেরকম পড়েছে তাতে ওকে লক্ষ্মীছাড়া রকম করে রাখা আর চলবে না। আমার সঙ্গে তোরা কেউ এলে বুঝতে পারতিস দেশের উৎসাহ এবং শ্রদ্ধা কত বেশি। আমার এতে কেবিল মনে হয় এবং লজ্জা হচ্চে—আনন্দ হচ্চে না। খুব ঘুরতে এবং খাটতে হচ্চে কিন্তু দক্ষিণ ভারতে আমার আসা সার্থক হয়েচে। না এলে অন্যায় হত। শান্তিনিকেতন যদি সত্যকার জিনিষ না হয় এবং স্থায়ী না হয় তবে মলেও আমার সে লজ্জা যাবে না। বাইরের লোকে ওকে যেরকম করে দেখচে আমাদের অধ্যাপকেরা

এখনো সেরকম করে দেখতে পাচ্চেন না। সেই জন্যেই আমি উদ্বিগ্ন আছি। ইতি ১লা ফাল্গুন।

১৯৩০ সালের ২৬শে মে তিনি অক্সফোর্ড থেকে লিখছেন :

Gilbert Murrayর সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হয়েচে। তাঁর সই নিয়ে অক্সফোর্ড থেকে ভারত সম্বন্ধে একটা চিঠি শীঘ্রই বেরবে।... ভারতবর্ষে ঠিক কি রকম কাণ্ড হচ্চে বুঝতে পারচি না। ঢাকায় খুনোখুনির জোগাড় হয়েচে দেখলুম। এটা সরকারী চাল বলে বোধ হচ্চে। আজ হ্যাভেলের ওখানে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ।

রাশিয়ার অভিজ্ঞতা তাঁকে কিরূপ ভাবিয়েছিল, আমেরিকায় একটি চিঠিতে আছে।

ক্ষণে ক্ষণে মনে বৈরাগ্য আসে। বসে বসে ছবি আঁকব, অল্পস্বল্প যা পারি তাই কাজ করব, অধিক কিছুই আশা করব না। কিন্তু সংসার-যাত্রাকে অত্যন্ত সহজ করে আনতে হবে—সুন্দর অথচ সুলভ। এবার রাশিয়ার অভিজ্ঞতায় আমাকে গভীরভাবে অনেক কথা ভাবিয়েচে। প্রচুর উপকরণের মধ্যে আত্মসম্মানের যে বিঘ্ন আছে সেটা বেশ স্পষ্ট চোখে দেখতে পেয়েছি। সেখান থেকে ফিরে এসে মেণ্ডেলদের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে যখন পৌঁছলুম একটুও ভালো লাগল না—ব্রেমেন জাহাজের আড়ম্বর এবং অপব্যয় প্রতিদিন মনকে বিমুখ করেচে। ধনের বোঝা কি প্রকাণ্ড এবং কি অনর্থক। জীবন-যাত্রার কত জটিলতা কত সহজেই এড়ানো যেতে পারে।

"জমিদারীর অবস্থা" সম্বন্ধে যা লিখেছেন, জমিদাররা তা পড়লে ভাল হয়।

জমিদারীর অবস্থা লিখেছিস্। যেরকম দিন আসচে তাতে জমিদারীর উপরে কোনোদিন আর ভরসা রাখা চলবে না। ও জিনিষটার উপর অনেককাল থেকেই আমার মনে মনে ধিক্কার ছিল এবার সেটা আরো পাকা হয়েচে। যে-সব কথা বহুকাল ভেবেচি এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমিদারী ব্যবসায়ে আমার লজ্জাবোধ হয়। আমার মন আজ উপরের তলার গদি ছেড়ে নীচে এসে বসেছে। দুঃখ এই যে ছেলেবেলা থেকে পরোপজীবী হয়ে মানুষ হয়েচি।

আমাদের কলকাতায় বাড়ি বিক্রি করা যদি সম্পূর্ণ দুঃসাধ্য না হয় তাহলে বেচে ফেলতে দোষ কি? তাহলে অনেকটা হাল্কা হওয়া যায়। আমার মনে পড়ে বাবামশায়ের কথা—একদিন কত বড়ো ভরসা নিয়ে বিষয়সম্পত্তির পনেরো আনা বিক্রি করে দিয়ে সংসার-যাত্রাকে হঠাৎ কত ধাপ নীচে নামিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা ছেলেবেলায় সেই কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ আলোতেই মানুষ হয়েছি। সংসারের উপকরণ যথেষ্ট সামান্য ছিল কিন্তু ভিতরের দিকে কোনো অভাব বোধ করি নি। আর একবার ঠিক তেমনি করেই বাইরের দিকের আসবাবকে কমিয়ে আনতে ইচ্ছে করে।

ঐ চিঠিতে "দেশের ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায় দেখা দিয়েচে" ব'লে তিনি যা লিখেছেন, তা আজকালকার দিন সম্বন্ধে আরও সুপ্রযোজ্য মনে হয়।

এদিকে দেশের ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায় দেখা দিয়েচে। অনেক কিছু উলট্‌পালট্ হবে। এই সময়ে বোঝা যত হালকা করতে পারব সমস্যা ততই সহজ হবে। জীবন-যাত্রাকে গোড়া ঘেঁষে বদল করবার দিন এল, সেটা যেন অনায়াসে প্রসন্ন মনে করতে পারি। যারা যত বেশি নানা জালে জড়িয়ে আছে তারা তত বেশি কষ্ট পাবে। দুঃখের দিন যখন আসে তখন তাকে দায়ে পড়ে মেনে নেওয়ার চেয়ে এগিয়ে গিয়ে মেনে নেওয়া ভালো—তাতে দুঃখের ভার কমে যায়—বৃথা ঝুটোপুটি করতে হয় না। ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দুঃখ সকলকেই পেতে হবে—এখনি পাচ্চে, সঙ্কট এড়িয়ে আরামে থাকবার প্রত্যাশা করাই ভুল। নূতন অভ্যাসের সঙ্গে নিজেকে বনিয়ে নেওয়া কিছুই শক্ত নয় যদি অন্তরের দিকে প্রস্তুত হয়ে থাকি, যদি পুরাতনের বাঁধন আপনা হতে আল্‌গা করে দিই—টানাটানি করতে গেলেই বাঁধন হয়ে ওঠে ফাঁসি।

শ্রীনিকেতনের কাজটি যে কত বড় তা তাঁর ঐ চিঠিতেই আছে—শ্রীনিকেতনের কর্ম্মীরা তা গভীর ভাবে উপলব্ধি করেন কিনা জানি না। যাঁরা করতেন তাঁদের কেউ কেউ পরলোকগত, কেউবা অবসৃত বা গৃহীতাবসর।

এটা খুব করে বুঝেছি আমাদের সবচেয়ে বড়ো কাজ শ্রীনিকেতনে। সমস্ত দেশকে কি করে বাঁচতে হবে ঐখানে ছোট আকারে তারি

> নিষ্পত্তি করা আমাদের ব্রত। যদি তুই রাশিয়ায় আসতিস এ সম্বন্ধে অনেক তোর অভিজ্ঞতা হোত। যাই হোক কিছু মালমসলা সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্চি দেশে গিয়ে আলোচনা করা যাবে। নিজেদের কথা সম্পূর্ণ ভুলতে হবে—তার চেয়ে বড়ো কথা সামনে এসেচে। ইতি ৩১ অক্টোবর ১৯৩০।

১৯৩৫ সালের ৪ঠা জুন লেখা চিঠিটিতে শ্রীনিকেতন সম্বন্ধে কবি আরও যা লিখেছেন, বিশ্বভারতীর সহিত—বিশেষতঃ শ্রীনিকেতনের সহিত—সম্পর্কযুক্ত সকলের তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

> শ্রীনিকেতন সম্বন্ধে লেনার্ডের মন পূর্ব্ববৎ অনুকূল আছে শুনে যে সম্পূর্ণ খুসি হয়েছি তা বল্‌তে পারি নে। অতি অনায়াসে ওর কাছ থেকে সাহায্য নিশ্চিন্ত মনে উপভোগ করাতে কর্ম্মকর্ত্তাদের ক্ষতি হয়েছে সন্দেহ নেই। নিজের উপার্জ্জন সম্বন্ধে যাদের কোনো আশঙ্কা নেই তারা কথায় কথায় বলে যেখানে শিক্ষাদানটা কর্ত্তব্য সেখানে আয়ের কথা ভাবা চলবে না। বাঙালীর অকর্ম্মণ্য মনোবৃত্তি ওখানে কেবলি প্রশ্রয় পেয়ে আসচে—নিজের আয়ের উপর নির্ভর করতে হলে যে চিন্তা ও চেষ্টায় দরকার সেটাই যে শিক্ষার প্রধান অঙ্গ সে কথা এরা কিছুতে বুঝবে না যে পর্য্যন্ত এরা বিপদে না পড়বে।

শান্তিনিকেতনের মাটির বাড়ীটির উপর কবির খুব প্রাণের টান ছিল।

> মাটির বাড়িটা খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে। নন্দলালের দল দেয়ালে মূর্ত্তি করবার জন্যে কিছুকাল ধরে দিনরাত পরিশ্রম করেছে—রাত্রে আলো জ্বালিয়েও কাজ চলেছিল। গ্রামের লোকদের ঔৎসুক্য সবচেয়ে বেশি। মাটির ছাদ হতে পারে এইটেতেই ওদের উৎসাহ। পাড়াগাঁয়ে খড়ের চাল উঠে গেলে সব দিক দিয়ে ওদের সুবিধে। যে রাজমিস্ত্রি এই বাড়িটা বানাচ্ছিল সে নিজের একটা মাটির ঘর ফেঁদেছে, তার মানে ওর মনে বিশ্বাস হয়েছে এটা ট্যাকসই। আমার সবচেয়ে আনন্দ এই কথা ভেবেই। শান্তিনিকেতনের এই কীর্ত্তি ওর অনেক প্রয়াসের চেয়ে প্রাধান্য লাভ করবে।

বিদেশ থেকে লেখা তাঁর অনেক চিঠিতে তাঁর আঁকা ছবি বিদেশে আদরের কথা আছে। একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন, "এখন

আমার বিশ্বাস হয়েচে ছবি এঁকে আমার ভবিষ্যতের একটা রাস্তা খোলসা হবে।”

অনেক চিঠিতে দেখা যায় কবি নানা গুরুতর বিষয়ে পুত্রের পরামর্শ জান্‌তে চাচ্ছেন। অনেক চিঠি থেকে বোঝা যায় তিনি রথীন্দ্রনাথকে কত বিশ্বাস করতেন, তাঁর উপর কত নির্ভর করতেন, তাঁর ভরসা কত রাখতেন। সুতরাং জীবনের শেষ কয় বৎসর যখন কবি ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য বিশ্বভারতীর পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্বাবধান করতে আর পারতেন না, তখন তার কাজ যদি ভালভাবে চলে থাকে, ও যে-পরিমাণে ভাল ভাবে চলেছিল, তার প্রশংসা বহু পরিমাণে রথীন্দ্রনাথেরই প্রাপ্য। কিন্তু তার বিপরীত কিছু ঘটে থাকলে তার জন্যও রথীন্দ্রনাথ সেই পরিমাণে দায়ী।

উৎস : *প্রবাসী*, ভাদ্র, ১৩৪৯, পৃ. ৫০০-৫০৪।

সংযোজন

নদী

অনেকে মনে করেন, মানব-প্রকৃতিটা ভগবানের একটা মস্ত ভুল : বিশেষতঃ শিশু-প্রকৃতি। বাস্তবিক অর্থে যদি একটা টেক্সট্‌বুক কমিটি থাকিত, এবং ভগবান্ যদি তাহার, কিম্বা তথাকার গুরুমহাশয়দের পরামর্শ লইয়া; শিশু-প্রকৃতি গড়িতেন, তাহা হইলে শিশুরা এত খেলা ভাল বাসিত না, দুপুর রোদে ঘরময় দাপাদাপি করিত না, ঠাকুরমার কাছে বসিয়া সন্ধ্যার আধ আলো আধ আঁধারে উপকথা শুনিতে চাহিত না, এবং এতটা স্বপ্নপ্রিয় ও কল্পনার দাস হইত না। ভগবান্‌কেও কষ্ট পাইয়া বেত গাছের সৃষ্টি করিতে হইত না। কিন্তু যা হ'বার নয়, তার জন্য দুঃখ করিয়া কি হইবে? শিশুগুলিকে ভগবান্ আমাদের কাছে পাঠাইয়াছেন। বহুকাল ধরিয়া দেখা গেল যে, ঠেঙ্গাইয়া শিশুদিগকে গোপালের মত সুশীল ও সুবোধ করা গেল না। তাহারা ক্রমাগত নামতা পড়িতে ত চায়ই না; এমন কি, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কবিগণ যে এমন চৌদ্দ অক্ষরের মিল যুক্ত নীতিগর্ভ কবিতানিচয় প্রণয়ন করিয়াছেন, তৎসমুদ্বয়ও অভিনিবেশ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতে চায় না। টেক্সট্‌বুক কমিটির চেয়ে ত ছেলেদের বৃদ্ধি ও নীতিজ্ঞান অধিক নয়। তাঁহারা এ সকল কবিতাকে অতি উপকারী বলিয়াছেন। তবু শিশুরা সেগুলি আপনা হইতে পড়ে না। এখন উপায় কি? আমাদের বরাবরই একটা সন্দেহ আছে; ভয়ে বলিতে পারি নাই। সন্দেহটা এই, সে আমরা অবশ্য খুব বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ জীব; কিন্তু হয়ত ভগবান্ নিতান্ত কাঁচা কারীকর না হইতেও পারেন। শিশুদিগকে ঠেঙ্গাইয়া পিটিয়া আমাদের মনের মত করিয়া গড়িতে ত পারা গেল না। এখন ভগবানের উপর হাতিয়ার না চালাইয়া শিশুদিগকে তাহাদের প্রকৃতির গতি অনুসারে বাড়িতে দিলে মন্দ হয় না। তাহাদের জ্ঞানার্জ্জনের মধ্যেও ক্রীড়াশীলতা আসুক না; তাহাতে ক্ষতি কি? বিড়ালছানাগুলি লেজ নাড়িয়া

লাফাইয় লাফাইয়া খেলা করে; নীতি ও গাম্ভীর্য্য ভাল বলিয়া ভগবান্ তো তাহাদের লেজগুলি কাটিয়া সংসারে পাঠাইয়া দেন নাই? ক্রীড়াশীলতা বোধ হয় পাপ নয়। কল্পনাটাও বোধ হয় মন্দ জিনিষ নয়। শিশুদের কল্পনা জাগাইয়া দেওয়া বরং ভাল বলিয়াই বোধ হয়। তুমি আমি হয়ত জ্ঞানের শুষ্ক হাড় চিবাইতে পারি; কিন্তু শিশুরা একটু রস চায়; সকল জিনিষই সৌন্দর্য্যের পরিচ্ছদে সজ্জিত দেখিতে চায়। তিনি তাহাদের এই নির্দ্দোষ ক্রীড়ায় সঙ্গী হইতে পারেন, তাহাদের কল্পনা সজাগ করিয়া তুলিতে পারেন, বিজ্ঞানকে তাহার সহচর সৌন্দর্য্যের সহিত একত্র করিয়া তাহাদের খেলার সাথী করিতে পারেন, তিনি তাহাদের পরম বন্ধু। আমরা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে শিশুদের বন্ধুত্ব-লিপ্সু দেখিয়া অতিশয় প্রীত ও আশান্বিত হইলাম। তাঁহার ‘‘নদী’’র সঙ্গে অনেক শিশু কল্পনার রথে চড়িয়া নানাদেশ ভ্রমণ করিবে। শিশুরা পড়িয়া পড়িয়া ইহার সুন্দর কাগজ ও ছাপা শ্রীহীন করিয়া দিলে আমরা সুখী হইব।

উৎস : *দাসী*, মার্চ ১৮৯৬, পৃ. ১৬৪-১৬৫।

পরিশিষ্ট

রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দবাবু

ক্ষিতিমোহন সেন

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে ১৯০৮ সালে আমি হিমালয় হইতে আসিয়া শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যোগ দিলাম। সেই বৎসরই রামানন্দবাবু এলাহাবাদ ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিলেন এবং ঠন্ঠনিয়ায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পাশে একটি ছোট্ট বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া প্রবাসী এবং মডার্ন রিভিউ এই দুইখানি কাগজ চালাইতে লাগিলেন। রামানন্দবাবু একেবারে সাদাসিধা মানুষ, নিতান্তই সরল তাঁহার জীবনযাত্রা। সেই বাড়ীখানির ক্ষুদ্র একখানি ঘরে প্রবাসী-মডার্ন রিভিউর অফিস। ক্রমে সেই স্থানটুকু নানাদেশীয় মনীষীদের একটি তীর্থক্ষেত্র হইয়া উঠিল। সেখানে হার্বার্ট, ফিশার, রামসে ম্যাক্‌ডোনাল্ড, সিস্টার নিবেদিতা, অধ্যাপক গেডিস প্রভৃতি বিদেশী বিশিষ্ট লোকদের এবং রবীন্দ্রনাথ ব্রজেন্দ্র শীল গোখলে প্রভৃতি ভারতীয় মহাপুরুষদের দর্শনীয় স্থান হইয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথ সেখানে বহুবার গিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পিছনেই ভুবন সরকার লেনে একটি বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় থাকিতেন। কবিগুরু প্রায়ই জোড়াসাঁকো হইতে পদব্রজে তাঁহার বাড়ীতে আসিতেন। সে আসিবার পথে এমন একটি সঙ্কীর্ণ গলি তিনি আবিষ্কার করিলেন যাহাতে এক জনের বেশি একসঙ্গে চলিতে পারে না এবং যাহা বস্তির মধ্যস্থিত দুই দিকের খোলার ঘরের মাঝখান দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আগে তাহার তলা দিয়া একটি ড্রেনও বহিত। এখন ড্রেনটা অন্যত্র সরিয়াছে তবে সঙ্কীর্ণতা সেইরূপই আছে। সেই গলিটুকু আমাকে শ্রীশবাবুর পুত্র পরলোকগত সন্তোষ মজুমদার দেখাইয়াছিলেন। এই গলি-পথে পথের দূরত্ব অনেকটা কমিত।

রামানন্দবাবুর উপর রবীন্দ্রনাথের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার বহু বাংলা গ্রন্থ প্রবাসীতে ছাপা হইয়াছে। প্রবাসীর পুরাতন সংখ্যাগুলি দেখিলেই তাহা

বুঝা যাইবে। মডার্ন রিভিউ কাগজেও তাঁহার অনেক ইংরাজি লেখা বাহির হইয়াছে। তখনকার দিনের প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ দেখিলেই বুঝা যাইবে যে রবীন্দ্রনাথের লেখা নাই এমন একটি সংখ্যাও বড় মিলিবে না। আর একখানি বাংলা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া—মধ্যে কয়েক বছর কাল রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীতে তেমন লেখা দেন নাই। তাহা ছাড়া তাঁহার বহু লেখাই প্রবাসীর মধ্য দিয়া প্রথম প্রকাশিত। এই কয়েকটি বৎসর বিগত হইলে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁহার লেখা প্রবাসীর জন্য পাঠাইয়া দেন।

যখন কবির ইংরাজি গীতাঞ্জলির জন্ম হয় নাই তখনও তাঁহার ইংরাজি লেখা মডার্ন রিভিউ পত্রে বাহির হইত। ১৯১১ সালে রামানন্দবাবু একবার তাঁহার কাছে তাঁহার কবিতার কিছু ইংরাজি অনুবাদ চাহেন। কবি তাঁহার বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়ের কথা "নিষ্ফল কামনা" (মানসী) কবিতার অনুবাদ রামানন্দবাবুকে পাঠাইয়া দেন। "Fruitless Cry"-নামে তাহা ১৯১১ সালের মে মাসের মডার্ন রিভিউ পত্রে (পৃ. ৪৬৩) বাহির হয়। লোকেন্দ্রনাথেরই করা রবীন্দ্র-কবিতার আর একটি অনুবাদ কবির কাছে ছিল। তাহার নাম সন্ধ্যাসঙ্গীতের "তারকার আত্মহত্যা"। "Death of a Star" নাম দিয়া তাহা ১৯১১ সালের আগষ্ট মাসের (পৃ. ২০১) মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় বাহির হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার আর একটি অনুবাদ মড ম্যাকার্থির করা ১৯১১ সালের মডার্ন রিভিউ কাগজের সেপ্টেম্বর মাসে (পৃ. ২৬১) "My Father's House" নামে বাহির হয়। ইহার পর রামানন্দবাবু স্বয়ং কবিকে ধরেন তাঁহার কবিতা নিজেই অনুবাদ করিতে। কবি বাল্যকালে ইংরাজি শিক্ষায় অবহেলা করিয়াছেন এই অজুহাত দেখাইয়া নিষ্কৃতি চাহিলেন। কবি তাঁহার মায়ার খেলা হইতেই উদ্ধৃত করিয়া দিলেন—

> "বিদায় করেছি যারে নয়নজলে
> এখন ফিরাব তারে কিসের ছলে?"

এই কবিতাটি কড়ি ও কোমলে ভুল নামে ছাপা হইয়াছে। রামানন্দবাবুও ছাড়িবার পাত্র নহেন। আমার মনে আছে রামানন্দবাবু একদিন কবিকে বলিলেন, "আপনি ইংরাজিকে নয়নজলে বিদায় করেন নাই। প্রেমের লীলার ওসব লোকদেখানো উপেক্ষার ভঙ্গীতে আমি ভুলিব না। তাহার সঙ্গে আপনার যে হৃদয়ের প্রীতিযোগ আছে সে কথা আমার কাছে লুকাইবেন না।" দেখিলাম অবশেষে কবিকেই হার মানিতে হইল। ১৯১২ সালে

ফেব্রুয়ারি মাসের মডার্ন রিভিউ পত্রে (পৃ. ২০৪) বাহির হইল "আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী" গানের অনুবাদ। তাহার পরই এপ্রিল মাসের (পৃ. ৩৫১) মডার্ন রিভিউ পত্রে কণিকা হইতে কয়েকটি কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হইল। তাহার পরেই আবার সেপ্টেম্বর মাসের মডার্ন রিভিউতে দেখা দিল "অনন্ত প্রেম" (মানসী) কবিতার অনুবাদ। ইংরাজি নাম তাহার "The Infinite Love"। তাহার বাংলা কথা "তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শতরূপে শতবার।" ইংরাজি বেশে কবিতাগুলি যেন অভিনব শোভা ধারণ করিল। "গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা" কবিতাটির (ঐ মাসেই পৃ. ২২৫) অনুবাদ "The Small" নামে দেখা দিল। ইহা উৎসর্গের ১২ নম্বরের কবিতা। ঐ সেপ্টেম্বর মাসের মডার্ন রিভিউতে (পৃ. ২৯৮) "Youth" নামে আর একটি অনুবাদ প্রকাশিত হইল তাহাও উৎসর্গেরই কবিতা।

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরী মৃগ সম (৭নং কবিতা)

এই যে আপন কবিতার অনুবাদে কবি প্রবৃত্ত হইলেন তাহারই ফল হইল গীতাঞ্জলি। কিন্তু এই অনুবাদের কর্মে যাঁহারা কবিকে প্রবৃত্ত করান তাঁহাদের মধ্যে রামানন্দবাবু একজন প্রধান। তাঁহারা কাগজেই এই কবিতাগুলির প্রথম আবির্ভাবের স্থান হয়।

আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে "ঠাকুর ফেলা" বলিয়া একটি ব্যাপার আছে। কৃপণ গৃহস্থকে বাধ্য করিয়া পূজা করাইবার জন্য লোকে গোপনে তাহার বাড়ীতে ঠাকুরের প্রতিমা রাখিয়া আসে। বাধ্য হইয়া কৃপণকে ব্যয়বাহুল্য করিয়া পূজা করিতে হয়। সৌন্দর্য্যসৃষ্টির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ কৃপণ ছিলেন এই কথা বলি না। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিনয়বশতঃ তিনি আপনার অপরিমিত শক্তি সত্ত্বেও সঙ্কুচিত হইতেন এবং এক এক সময় নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ বুঝিতে পারিতেন না। তখন বাহিরের উপদ্রবে শুক্তির মধ্যে মুক্তার মত তাঁহার রচনাগুলি এক একটি রত্নের মত সৃষ্ট হইয়া উঠিত।

একবার শ্রীযুক্তা সরলা দেবী কবিকে না জানাইয়া নিজের কাগজে এক বিজ্ঞপ্তি দেন যে কবি একটি নাটক লিখিবেন। আমরা পাইলাম "চিরকুমার

সভা"। শান্তিনিকেতনে ১৯০৮ সালে আমরা তাঁহাকে আমাদের জন্য ঋতু-উৎসবের গান ও নাটক রচনার জন্য ধরি। তাহার ফলে শারদোৎসব প্রভৃতি নাটকের সৃষ্টি। তিনিও তাহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন আমাদের অভিনয়ে নামাইয়া। প্রথম বার শারদোৎসবে কবি বাধ্য করিয়া আমাকে সম্রাট-সন্ন্যাসীর বেশে রঙ্গমঞ্চে নামাইলেন। আমার গান গাহিবার অসামর্থ্যের ওজর কবি মানিলেন না। অন্তরাল হইতে আমার হইয়া অপূর্ব গান তিনি গাহিলেন। তাহার দুর্গতি আমি দীর্ঘকাল বহন করিয়াছি। সর্বত্রই সভাস্থলে গানের জন্য বহুদিন আমাকে লোকে ব্যর্থ পীড়াপীড়ি করিতেন।

কর্মশ্রান্ত রবীন্দ্রনাথ এক এক সময় 'প্রবাসী'তে লেখার কথা ভুলিয়াই যাইতেন। এমন সময় শেষ মুহূর্তে যখন রামানন্দবাবুর তাগিদ সহ লোক আসিত তখন তিনি তাহাকে বসাইয়া সেই মুহূর্তেই লেখার জন্য বসিতেন। ''গোরা''র * জন্য এইরূপ অনেক কিস্তি তাঁহার লোক বসাইয়া লেখা। তাই মাঝে মাঝে সেই সব পুস্তকে ছোটখাট ভুলচুকও রহিয়া গিয়াছে। দারুণ গ্রীষ্ম, জানালা কবাট সব খোলা, বাহিরে 'প্রবাসী'র লোক, রবীন্দ্রনাথ মাদুরে বসিয়া লেখা শেষ করিতেছেন, এই দৃশ্য বহুবার দেখিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও বহু লেখা এবং রবীন্দ্রনাথের লেখার অন্যের কৃত ইংরাজি অনুবাদও রামানন্দবাবু চিরদিন আগ্রহ করিয়া ছাপাইয়াছেন।

রামানন্দবাবুর সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে যে কবির মতভেদ হইত না তাহা নহে তবে তাহাতে তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে নাই। ১৯১৭ সালে মিসেস্ বেসান্টকে যখন কবি কংগ্রেসের নেতৃত্ব দিতে চাহেন তখন রামানন্দবাবু তাহাতে সম্মত ছিলেন না। ননকো-অপারেশনের অনেক প্রসঙ্গে উভয়ের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের এমন মতভেদ কত বারই হইয়াছে। অসহযোগ লইয়াও মতভেদ

---

* এরই কিছুকাল পরে একদিন রামানন্দবাবু আমাকে কোনো অনিশ্চিত গল্পের আগাম মূল্য স্বরূপ পাঠালেন তিনশো টাকা। বললেন, যখন পারবেন লিখবেন, নাও যদি পারেন আমি কোনো দাবী করব না। এত বড়ো প্রস্তাব নিষ্ক্রিয়ভাবে হজম করা চলে না। লিখতে বসলুম ''গোরা''—আড়াই বছর ধরে মাসে মাসে নিয়মিত লিখেছি, কোনো কারণে একবারো ফাঁক দিই নি। যেমন লিখতুম তেমনি পাঠাতুম।'' রবীন্দ্রনাথ, (প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪৪)।

ঘটিয়াছে। প্রবল লোকমতের বিরুদ্ধে ১৯২১ সালে ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে রবীন্দ্রনাথ "সত্যের আহ্বান" পড়িয়াছেন। মহাত্মাজী রামমোহনকে ক্ষুদ্র বলায় কবি অত্যন্ত আহত হইয়া তীব্রভাবে তাহার প্রতিবাদ করেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে অসহযোগের স্থলে তিনি "শিক্ষার মিলন" বিষয়ে ইন্‌স্টিটিউটে ও আলফ্রেড থিয়েটারে বলেন। তবু মহাত্মাজীর প্রতি কবির শ্রদ্ধা যে ছিল অপরিসীম তাহা সকলেই পরে জানিয়াছেন। ননকো-অপারেশন বহুপূর্বে মহাত্মাজী যখন দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে দেশে আসেন তখন গুরুশিষ্য সমেত মহাত্মাজীর মস্ত ফিনিক্‌স্ বিদ্যালয়টি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনেই দীর্ঘকাল আতিথ্য লাভ করিয়াছিল। মহাত্মাজীরও কবির ও তাঁহার আশ্রমের প্রতি গভীর প্রীতি যে রহিয়াছে সে কথাও সকলেই জানেন।

'প্রবাসী'তে মাঝে কিছুদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার লেখা দেন নাই। তারপর একদিন যে নিজেই 'প্রবাসী'র জন্য রামানন্দবাবুকে তাঁহার লেখা দেন সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি।

রাজা, শারদোৎসব প্রভৃতি যে-সব নাটক আশ্রমে অভিনীত হইত তাহাতে প্রত্যেক বারেই সপরিবারে রামানন্দবাবু আসিতেন। এই ভাবে বহুবার তাঁহারা শান্তিনিকেতনে আসিয়াছেন। নোবেল প্রাইজ পাইবার পরে কবিকে সম্বর্ধিত করিবার জন্য স্পেশ্যাল ট্রেনে যে একদল সাহিত্যিক কলিকাতা হইতে আসেন সেই ১৯১৩ সালের ২৩শে নভেম্বর সপরিবারে রামানন্দবাবু তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন।* ১৯১৭ সালের রবীন্দ্রনাথের

---

* বাংলা ১৩১৮ সালে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ পূর্ণ হওয়ায় টাউন হলে যে কবি-সম্বর্ধনা ১৪ই মাঘ হয়, সেখানেও তিনি সপরিবারে উপস্থিত হন, সেই উপলক্ষে রামানন্দবাবুর লেখার উপসংহারে ছিল, "তাঁহার সম্বর্ধনার জন্য বাঙালী আরও অধিক আয়োজন করিলেও অতিরিক্ত হইত না।" রবীন্দ্রনাথের সত্তর পূর্ণ হওয়ার পর কলিকাতার রবীন্দ্র-জয়ন্তী সভায় "গোল্ডেন বুক অব ঠাকুর" কমিটির সভাপতি ও গোল্ডেন বুকের সম্পাদক রামানন্দবাবু রবীন্দ্রনাথকে "গোল্ডেন বুক" উপহার দেন। "গোল্ডেন বুক"-এর ভূমিকা রামানন্দবাবুর লেখা। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎপূর্তি উৎসব কমিটির একজন প্রধান সভ্য রামানন্দবাবু ছিলেন। কবির সত্তর বৎসরের জয়ন্তী কমিটির প্রথম সভা আহ্বান স্যর জগদীশ, স্যর প্রফুল্লচন্দ্র ও রামানন্দবাবু প্রভৃতির নামে হয়।

জন্মোৎসবে আসিয়া রামানন্দবাবু শান্তিনিকেতনের সব ব্যবস্থা দেখিয়া তাঁহার ছেলে প্রসাদকে এখানে রাখিয়া পড়াইতে উৎসুক হইলেন। প্রসাদের ডাকনাম ছিল মুলু। মুলু'র তো উৎসাহের সীমা নাই। কিন্তু মুলুর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না বলিয়া কথা হইল যদি একখানা কুঁড়ে ঘর পাওয়া যায় তবে তাহাতে মুলুকে এখানে রাখা যায়, সঙ্গে তাহার মা বাবা বোন কেহ থাকিতে পারেন।

নাগপুরের স্যর বিপিনকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের পুত্র শচীন্দ্র বসু মহাশয় ছিলেন আগরার রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের শিষ্য। তিনি কিছুকাল এই আশ্রমে অবৈতনিক অধ্যাপকের কাজ করেন। সে সময়ে কঠোর সাধনায় তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। তাঁহার স্ত্রী তাই তাঁহাকে লইয়া এখানে বাস করিবার জন্য একটি কুটির করেন। পরে তাঁহাদের এক কন্যা পীড়িত হওয়ায় এবং পরে কন্যাটি মারা যাওয়ায় তাঁহারা এই বাস উঠাইয়া লইয়া যান। ১৯১৭ সালে রামানন্দবাবুরা সেই কুটিরখানি কিনিয়া শান্তিনিকেতনে বছর দুই কাল বাস করেন। তখন রামানন্দবাবু মাঝে মাঝে কলিকাতায় প্রবাসী ও মডার্ন রিভিয়ুর জন্য গেলেও প্রায়ই এখানেই থাকিতেন। মুলুর সঙ্গে সীতা দেবী ও শান্তা দেবীও থাকিতেন। তাঁহাদের মাতা মাঝে মাঝে এখানে আসিতেন। রামানন্দবাবুর বড় ছেলে কেদারনাথ তখন বিলাতে।

এই সময়ে প্রায়ই রামানন্দবাবু কবির কাছে দেহলী গৃহের ছাদে আসিয়া বসিতেন। চমৎকার নানা প্রসঙ্গ হইত। রামানন্দবাবু ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই শিশুদের জন্য জগতের নানা সাহিত্য হইতে ভাল ভাল জিনিস লইয়া বাংলা ভাষাতে নূতন নূতন সব গ্রন্থ রচনা বিষয়ে আলোচনা করিতেন। বিশ্বের নানা দেশের সাহিত্যের ভাল ভাল পুস্তক অনুবাদ করিয়া বাংলা-সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য উভয়ের মধ্যে অনেক আলাপ চলিত। পরে সেই বিষয়ে কিছু কিছু চেষ্টা বিশ্বভারতী হইতে করাও হইয়াছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বাংলা-সাহিত্য অপেক্ষা হিন্দুস্থানী, গুজরাটি ও মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্যেই কাজ হইতেছে অনেক বেশি। কোন্ কোন্ সাহিত্য হইতে কোন্ কোন্ বিষয়ে কি কি বই অনুবাদ করিতে হইবে তাহারও একটি সম্পূর্ণ তালিকা রবীন্দ্রনাথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

এক-এক দিন য়ুরোপীয় রাজনীতির কথা উঠিত। একদিন কবিগুরু বলিলেন, ''যত দিন লোকে যাহা উৎপন্ন করিতে পারে তাহার চেয়ে বেশি

ব্যয় ও সম্ভোগ করিতে বিরত না হইবে তত দিন পররাজ্যের প্রতি লোভ, অন্যকে নানাভাবে প্রবঞ্চনা, জোর-জুলুম প্রভৃতি নানাবিধ পাপের অন্ত হইবে না। প্রাচীন ভারত তাহার জীবন অত্যন্ত শান্ত সরল ও সংযত করিয়াছিল অথচ তাহার তত্ত্বচিন্তা ছিল খুব উচ্চ ধরণের। যতদিন ভারতীয় এই প্রাচীন পুণ্য আদর্শ লোকে গ্রহণ না করে ততদিন জগতে জোর-জুলুম যুদ্ধ কিছুতেই থামিতে পারে না। ভারতের ব্রাহ্মণেরা এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নিজেরাও দীর্ঘকাল সেইরূপ জীবনযাপন করিয়াছেন। তাহার পর ব্রাহ্মণদের সেই আদর্শ হারাইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতেরও দুর্গতি হইল। এখন জগতের অন্য সব দেশে কোন্ লজ্জায় এই যুগের ব্রাহ্মণেরা এই আদর্শের কথা প্রচার করিবেন? আপনি রামানন্দবাবু কিন্তু ব্রাহ্মণদের সেই আদর্শটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। বড় বড় চাকুরী করিয়াও ব্রাহ্মণত্বের বড়াই ও আদর্শ প্রচারের মত নির্লজ্জতা আর নাই।"

রামানন্দবাবু বলিলেন, "দেখুন, আপনিও এই বিষয়ে নিঃসঙ্কোচে উপদেশ দিতে পারেন। দূর হইতে আপনাকে দেখিলে মনে হয় আপনার বুঝি খুব আড়ম্বরময় জীবন। কিন্তু কাছে আসিয়া দেখি আপনার জীবনযাত্রাও খুব সাদাসিধা। আপনার ঘরে একখানি হাতপাখা পর্য্যন্ত নাই। দারুণ গ্রীষ্মে মধ্যাহ্নে আপনি সব জানালা দরজা খুলিয়া সারা দুপুর চৌপর দিন কাজ করেন। চেয়ার নাই, টেবিল নাই, মাদুরে বসিয়া সামান্য ডেস্কে রাখিয়া লেখেন। ঘরের জিনিস শিকাতে ঝুলাইয়া রাখেন। আসলে আপনার চেহারাটাই রাজসিক। একখানি ফর্সা কাপড় পরিলেই আপনাকে রাজার মত দেখায়।"

রামানন্দবাবু ও তাঁহার কন্যাগণ খুবই সহজভাবে জীবনযাপন করিতেন। রান্না-বান্না কন্যারা নিজেরাই করিতেন। অনেক সময় চাকরের অভাবে কাজকর্ম সবই নিজেরা সারিতেন।

১৯১৭ সালের ৮ই পৌষ মধ্যাহ্নে আহারান্তে কবিগুরু রামানন্দবাবুকে বলিতেছিলেন, "এইরূপ সহজভাবে শিক্ষালাভ করাই ছিল ভারতের আদর্শ। আমাদের দেশে আলো-বাতাসের মত জ্ঞানও ছিল সর্বসাধারণের সাধারণ ধন। তাহা গুরুর কাছে পয়সা দিয়া কিনিতে হইত না। শিষ্যের কাছে পয়সা লইয়া তাহা বেচাও চলিত না। ছেলেদের পড়ার ব্যয় পিতা বা অভিভাবককে বহন করিতে হইত না। ছাত্ররা সব ব্রহ্মচারী। যেখানেই সে দাঁড়াইয়া অন্ন

চাহিবে, 'ভবতী ভিক্ষাং দেহি' বলিবে, সেখানেই তাহার জন্য অন্ন আছে। অর্থাৎ সমস্ত সমাজের হইয়া সে জ্ঞানের সাধনা করিতেছে। জ্ঞান যে ছিল তখন সবারই ধন।"

"গ্রীকদের মধ্যে ছিল অন্যরূপ। প্রচুর মূল্য দিয়া তাহাদের বিদ্যা কিনিতে হইত। তাই তাহা বেচাও চলিত। বিদ্যা ছিল সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আজ য়ুরোপের সেই দুষ্ট আদর্শ আমাদের দেশে চাপিয়া বসিয়াছে। প্রাচীন কালে তপোবনে বসিয়া ভারতের যে সরল উন্নত ও মহান আদর্শ ছিল তাহাই স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলাম এই শান্তিনিকেতনে। আমার তখনকার দিনের সীমাবদ্ধ আয় লইয়াও আমি আমার দিক হইতে কম চেষ্টা করি নাই। কিন্তু তবু পারিলাম না। সমাজের সেই সহযোগিতা পাই নাই। তাই পরিশেষে আপন আপন ছেলেদের ব্যয়ের জন্য অভিভাবকদের শরণাপন্ন হইতে হইল। প্রথমে আমি বহুকাল এই জন্য ছেলেদের পিতামাতার কাছেও কিছুই চাহি নাই। যখন পিতামাতারা ছেলেদের ব্যয় কিছু কিছু দিতেই আরম্ভ করিলেন তখন আর 'বিদ্যা সর্বসাধারণের' এই কথা এখানে বলা চলিল না। পিতামাতারাই যখন সন্তানদের শিক্ষার ব্যয় বহন করিতেছেন তখন এই শিক্ষার মালিকও তাঁহারাই। ইহা এখন তাঁহাদের বৈষয়িক সম্পত্তিরই মধ্যে।"

গভীর দুঃখে কবি এই কথা কয়টি বলিলেন। রামানন্দবাবু বলিলেন, "দেখুন আমিও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সন্তান; প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের মধ্যে শিক্ষার যে সর্বজনীন সামাজিক রূপ ছিল তাহার কতটা আজও আছে আমাদের দেশের টোল ও চতুষ্পাঠীর মধ্যে। আমিও এইরূপ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরেরই ছেলে। আমি আপনার মনের দুঃখটা বুঝতে পারি। আজ শিক্ষার জন্য যে ব্যয়, তাহাতে কয়জন লোক সন্তানকে শিক্ষিত করিতে পারেন? ব্রহ্মদেশে শিক্ষাটা সমাজ-ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া সেখানে কেহই নিরক্ষর নাই। আজ ভারতের সর্বত্র অজ্ঞান ও অন্ধকার। আপনি সেই সাধনাকে মনে মনে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাকে এত সহজে ছাড়িয়া দিবেন না। নিষ্ফল হইলেও আবার চেষ্টা করুন।"

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনার এই কথা আমারও মনে জাগিতেছে। যদি ভুলিয়া যাই তবে মাঝে মাঝে স্মরণ করাইয়া দিবেন।" তার পরই প্রায়ই দেখিয়াছি রামানন্দবাবুর সঙ্গে গুরুদেবের দেখা হইলেই রামানন্দবাবু তাঁহার

সেই আদর্শ পুনঃ-স্থাপনার কত দূর হইল তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন। যখন শ্রীনিকেতনে শিক্ষাসত্রের কল্পনা গুরুদেবের মনে স্থির হইল তখন তিনি রামানন্দবাবুকে একদিন বলিলেন, ‘‘দেখুন এখন আমি আমার সেই সঙ্কল্পকে যে আবার প্রাণবান করিতে পারিব সেই সম্ভাবনা আসিয়াছে।’’

শিক্ষাসত্রের কার্য্য তখনও আরম্ভ হয় নাই, তাহার কিছুদিন পরেই শিক্ষাসত্রের কাজ কবি আরম্ভ করিলেন।

রামানন্দবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘‘আপনার শিক্ষার প্রণালীর কি কিছুটা ঠিক করিয়াছেন?’’ গুরুদেব বলিলেন, ‘‘একেবারে আগে হইতে সব ঠিকঠাক করিয়া রাখা আমার স্বভাব নহে, জীবনের ধর্মও তাহা নহে, এবং তাহা আমি প্রার্থনীয়ও মনে করি না। তবু আমার মনে মনে যে-একটা সুস্পষ্ট রূপ জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা মোটামুটি এইরূপ’’ :

১। প্রাকৃত সৌন্দর্য্য ও সহজ জীবনযাত্রার মধ্যে খেলাধুলার সঙ্গে সঙ্গে ‘‘শিশুরা আনন্দের সহিত জ্ঞানে ও কর্মে প্রকৃতির সঙ্গে অজ্ঞাতসারে যুক্ত হইয়া উঠিবে।’’

‘‘মধ্যাহ্নের আলোর মত প্রভাতের আলো বর্ণহীন নয়। শিশুর মনে তাই বর্ণ গন্ধ গীত চাই। ফুল ও ফল তাই বীজের মত প্রাণমাত্র সম্বল নয়, তাদের মধ্যে বর্ণগন্ধরস আছে। শিশুর মনের মধ্যেও সেই বর্ণগন্ধরসময় আনন্দস্পর্শ থাকা চাই। বীজরূপে যে পরিণতি তাহা পরে স্বভাবের নিয়মে ধীরে ধীরে আসিবে।’’

২। ‘‘বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিশু খেলা ছাড়িয়া আত্মশক্তিতে বিশ্বাস লাভ করিবে। ব্রতে ও সাধনায় ক্রমে সে শক্তিলাভ করিয়া বীর্য্যবান হইয়া উঠিবে। নানাবিধ সেবা ও ব্রতের দ্বারা সে আপনার পূর্ণ স্বরূপকে তখন উপলব্ধি করিবে।’’

৩। ‘‘এই জন্য তাহার চারিদিকে প্রকৃতির ও মানবের একটি নির্মল ও বিশাল পরিমণ্ডল থাকা প্রয়োজন। যাহাতে তাহার সমস্ত জীবন ও সাধনা দূষিত ও বিকৃত না হইয়া উঠে সেদিকে সচেতন থাকিতে হইবে। তরুণ জীবনের সহজ আবেগগুলিও যেন তাহাকে অধঃপাতের দিকে না টানিয়া দিনে দিনে নব নব শক্তিলাভের ক্ষেত্রেই অগ্রসর করিতে থাকে সেইরূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত।’’

৪। "মাতৃভাষার সাহায্যে তাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে। শিক্ষার মধ্যে ভয় বা লোভের কোনো স্থান থাকিবে না। জিগীষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবও শিক্ষাকে বিকৃতির পথে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে।"

৫। "বালকের ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক বোধকে জ্ঞানে ও কর্মে ধীরে ধীরে উন্মেষিত করিতে হইবে।"

৬। "প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ ভাল করিয়া অনুভব করিবার জন্য বালকের মনোবৃত্তিগুলি ধীরে ধীরে বিশুদ্ধ ও সুকুমার করিয়া তুলিতে হইবে। এই সুকুমারতা দুর্বলতা নহে। অরণ্যের কঠিন কাষ্ঠের মূলে যেমন সুকুমার পুষ্প, তেমনি বীর্য্যবান মানবের সাধনার মূলে এইরূপ সব সুকুমার তপস্যা।"

৭। "শিক্ষা যেন শিক্ষার্থীকে সর্বাঙ্গসুন্দর পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করে। সেইজন্য শুধু জ্ঞান বা ভাবের দিকে ঝুঁকিলেই চলিবে না। শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত কলা প্রভৃতি সর্ব দিকেই মানুষকে সম্পন্ন হইতে হইবে। এবং তাহার সকল কর্মে ও জীবনে তাহার এই ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ যাহাতে হয় তাহাও দেখিতে হইবে। তাহার ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবনের মধ্যে যেন কোথাও অর্থহীন একটা বিচ্ছেদ বা বিরোধ না থাকে।"

৮। "শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে তাহার চারিদিকের মানবসমাজের সুখ-দুঃখ সম্পদ-বিপদের যেন যোগ থাকে। দেশের প্রাচীন ইতিহাস, সামাজিক উৎসব আনন্দাদির সহিতও তাহার যোগ থাকা চাই। স্বদেশেরই দীর্ঘ প্রাচীন কাল ও স্বকালের ও সর্বদেশের সঙ্গে তাহার কোথাও যেন বিচ্ছেদ বা বিরোধ না ঘটে। জীবনে কোথাও চীনের প্রাচীর গড়িয়া উঠিতে দেওয়ার মত দুর্গতি আর নাই। সংস্কারগুলি জ্ঞানরাজ্যের এইরূপ অলঙ্ঘ্য প্রাচীর।"

৯। "কাজেই জগতের সর্বদেশ ও সর্বজাতির সঙ্গে তাহার জ্ঞান ও হৃদয়ের একটি যোগ ও সম্বন্ধ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠা চাই।"

১০। "ব্যক্তিত্বের সাধনার সঙ্গে যদি স্থান কাল ও সামাজিক সাধনার যথাযথ যোগ থাকে তবে অহমিকার নানা দুঃখ ও দুর্গতি ঘটিতে পারে না। ধারার মধ্যে পাথর গড়াইয়া গড়াইয়া গোল হইয়া শালগ্রাম হইয়া উঠে। জগতের বহমান ধারার মধ্যে নিজেকে এই জন্য স্থাপন না করিলে অহমিকার দুঃখময় নানা তীক্ষ্ণ ও তীব্র বিকার হইতে রক্ষার আর কোনো উপায় থাকে না।"

১১। "এই জন্য শিক্ষার্থীকে অন্যসব শিক্ষার্থীর সঙ্গে নানা মঙ্গলচেষ্টায় আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। সেই উৎসর্গও নীরস হইলে চলিবে না। তাহাতে শিল্প-কলা সঙ্গীত প্রভৃতির আনন্দ যাহাতে থাকে তাহা দেখা চাই। জলের ধারার মধ্যেই পাথরের তীক্ষ্নতা ক্ষয় হইয়া শালগ্রাম হয়। মানুষও রসের ধারাতেই আপনার তীক্ষ্নতা পরিহার করিতে শেখে।"

এই সব শুনিয়া রামানন্দবাবু বলিলেন, "আপনার মনে যে শিক্ষার একটি সুস্পষ্ট রূপ আসিয়াছে তাহা চমৎকার ও পূর্ণাঙ্গ। কিন্তু তাহা কি আপনি ছেলেদের জন্যই বন্ধ রাখিতে চাহেন? এই সঙ্গে কি মেয়েদের কথাও ভাবেন?"

গুরুদেব বলিলেন, "মেয়েদের কথাই আমার সর্বাগ্রে মনে হয়। শিশুদের দুঃখ দেখিয়াই আমি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম করি। এখন আরও কোথাও কোথাও ছেলেদের জন্য চেষ্টাও হইতেছে। কিন্তু মেয়েদের জন্য এখনও তেমন কোনো আয়োজন হয় নাই। আর মেয়েদের দুঃখও অনেক আছে। তাহা আমার অন্তরকে বড়ই ব্যথিত করে। কিন্তু শুধু মেয়েদের দিয়াই তাহা চালানো যাইবে না। আপনি ও নেপালবাবু প্রভৃতি না থাকিলে তো চলিবে না। শান্তিনিকেতনে শিক্ষার দুঃখ দূর হয় ইহাই আমার বিশেষ ইচ্ছা।"

নেপালবাবু তখন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের আদিকালে নেপালবাবু যুক্ত থাকিয়া বহু কন্যাকে তখন শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে তাঁহার একটু যশও ছিল। এই জন্য মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে তিনি নেপালবাবুর মতামত নিতেন। শান্তিনিকেতনে মেয়েদেরই জন্য বিশেষভাবে ক্রমে প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিবে ইহা তাঁহার মনেও ছিল, মুখে ও পত্রাদিতে তাহা বারবার ব্যক্ত হইয়াছে।

গুরুদেব বিদ্যালয়ের প্রথম যুগে রীতিমত ছাত্রদের অধ্যাপনা করিতেন। তাহার পরও তিনি ছেলেদের লইয়া শেলি ব্রাউনিং প্রভৃতি কবির কঠিন কঠিন কবিতা লইয়া অধ্যাপনা করিতেন। যে বয়সের ছেলেদের লইয়া যেরূপ কঠিন বিষয় তিনি আলোচনা করিতেন তাহাতে অনেকের মনে হইতে পারে যে ছেলেরা তাহা কখনই বুঝিতে পারে না। কিন্তু তাঁহার অপূর্ব পড়াইবার

পদ্ধতিতে সকলেই চমৎকার বুঝিতে পারিত। এইসব অধ্যাপনার সময়ে রামানন্দবাবুও এখানে থাকিলেই আসিয়া বসিতেন। কলিকাতার বহু প্রখ্যাত পণ্ডিত ও অধ্যাপক কোনো কারণে আশ্রমে আসিলে তাঁহারাও রবীন্দ্রনাথের সেই অধ্যাপনার ক্লাসে যোগ দিতেন। কবি তাহাতে সঙ্কুচিত হইলেও তাঁহারা বাধা মানিতেন না। রবীন্দ্রনাথ রামানন্দবাবুকে বলিতেন, "মহাশয়, আমি ছোট ছেলেদের পড়াই। তাদের বিষয়ে অভিজ্ঞতা আমার আছে। কিন্তু বড়দের পড়াইবার অভিজ্ঞতা আমার নাই। সেখানে আপনি আমাদের চালাইতে পারেন। আপনার ক্ষেত্রে তো আমি দেখিতে যাই না। আপনি কেন এই ছোটদের আসরে আসেন?"

বিশ্বভারতীতে যখন শিক্ষাভবন অর্থাৎ কলেজ বিভাগ স্থাপিত হয় তখন কবি রামানন্দবাবুকে আনিয়া সেই বিভাগের অধ্যক্ষতা দেন। রামানন্দবাবু বিনা বেতনে সেই কাজে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকাল কাজ করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিশ্বভারতীর যোগের বিষয়ে তাঁহার অন্য মত থাকায় তিনি অধ্যাপক পদ ছাড়িয়া দেন। ১৩৩২ সালের ৬ই ভাদ্র লেখা সেই বিষয়ক পত্রও আমি দেখিয়াছি।

যাহা হউক ১৯১৭ ও ১৯১৮ সালে যখন রামানন্দবাবু এখানে ছিলেন তখন অনেক সময় তিনি ছাত্রদের সাহিত্যসভায় উপস্থিত থাকিতেন এবং সভাপতির কাজও করিতেন। তাহাতে নানা বিষয়ে ভাল ভাল উপদেশও রামানন্দবাবু দিয়াছেন। সেই সব সভার কার্য্যবিবরণী খুঁজিয়া দেখিলে রামানন্দবাবুর অনেক আন্তরিক অপূর্ব উপদেশের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

গুরুদেবের ক্লাসে ছেলেদের চট্‌পট্ উত্তর শুনিয়া রামানন্দবাবু বিস্মিত হইতেন। গুরুদেব ছেলেদের ভুল উত্তরে দুঃখিত হইতেন না। নিরুত্তর থাকিলে বিরক্ত হইতেন। একদিন রামানন্দবাবু আমাকে বলিলেন, "ঐ সব কবিতা যে কি করিয়া কবিগুরু এই সব শিশুদের মনের মধ্যে এমন ভাবে প্রবেশ করাইয়া দেন তাহাও একটা বিস্ময়ের বস্তু।"

১৯১৮ সাল, বর্ষাকাল। একদিন সন্ধ্যার সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গল্পের মূল সূত্রগুলি কেমনভাবে পাইলেন, সেই কথা বলিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "কাবুলীওয়ালা গল্পের মিনি হইল আমার বড় কন্যা বেলা। সে ঠিক ঐ রকম।

জন্য আপন যাহা কিছু সঞ্চয় তাহা সে ব্যয় করিত। বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া পরিত্যক্ত সব খবরের কাগজ সংগ্রহ করিয়া কাঁধে করিয়া বহিয়া সে বোলপুর শহরে বিক্রয় করিয়া আসিত। অর্থ যাহা পাইত তাহা সে নৈশ বিদ্যালয়ে ও দুর্গতদের সহায়তায় ব্যয় করিত। এই জন্য টাকা সংগ্রহ করিতে আশ্রমের উৎসবে আনন্দবাজারে ছেলেদের লইয়া সে প্রদর্শনী খুলিত, সার্কাসের আয়োজন করিত। তাহার এই সব উৎসবের কাজে গুরুদেব ও রামানন্দবাবু অর্থ সাহায্য করিতেন। মাঝে মাঝে মুলু নৈশ বিদ্যালয়ের গরীব ছেলেদের বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইত। তাহাতে রামানন্দবাবুর বিশেষ উৎসাহ ছিল। খুব অল্পদিন মুলু বাঁচিয়াছিল। ১৯১৯ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর মুলু কলিকাতায় সামান্য কয়েক দিন রোগে ভুগিয়া মারা যায়। রামানন্দবাবু ও তাঁহার স্ত্রী তাহাতে বড়ই মর্মাহত হইলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে এই শোকের সময় প্রায়ই সান্ত্বনা দিয়া পত্র লিখিতেন। পরদুঃখকাতরতায় ও লোকসেবাতেও মুলু রামানন্দবাবুরই পুত্রের যোগ্য ছিল।

মুলুর পূর্ণ নাম ছিল মুক্তিদাপ্রসাদ। প্রসাদ ও মুলু নামেই সে পরিচিত।

তাহার মৃত্যুর পর রামানন্দবাবু তাহার স্মৃতিরক্ষার্থ যে অর্থ দান করেন তাহার সহায়তায় এখনও সেই প্রসাদ বিদ্যালয়ের সেবাকার্য্য চলিতেছে। গ্রামবাসী দরিদ্র শিশুরা এখনও সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া মুলুর সেই সেবার স্মৃতিকে জীবন্ত রাখিয়াছে।

দয়া-দাক্ষিণ্য উদারতা প্রভৃতি নানা ভাবেই মুলু ছিল উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান। রামানন্দবাবু যে কত বড় মহদাশয় মানুষ ছিলেন তাহার একটি পরিচয় বিশ্বভারতীর ইতিবৃত্ত হইতেই আমরা দিতে পারি। এক সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গ্রন্থগুলির সমস্ত হিন্দী অনুবাদের অধিকার ও মালিকানা নিজে হইতেই রামানন্দবাবুকে দিয়াছিলেন। তাহার বহু বৎসর পরে রামানন্দবাবুকে প্রদত্ত এই মালিকানা স্বত্বটা বিশ্বভারতীর পক্ষে পুনরায় পাওয়া একান্ত আবশ্যক হইল। এই স্বত্বটা না পাইলে বিশ্বভারতীর শুধু যে আয়ের ক্ষতি হয় তাহা নহে, রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর ভারতীয় অনুবাদগুলির সুব্যবস্থাও বিশ্বভারতী করিতে পারেন না। অথচ যে বস্তু দিয়া দেওয়া হইয়াছে

লইয়া খুব গল্প জমাইয়া বসিয়াছেন। দেখা হইলেই তাঁহার মুখে শুনিতে পাইতাম আমার কন্যাদের ও নাতনীদের বিষয়ে অনেক গল্প ও তাঁহার নাতনীদের সব গল্প।

রামানন্দবাবু নীতিপরায়ণ বলিয়া কাব্যরস ও জীবনের রস সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। এই বিষয়ে তাঁহার মত খুব উদার ছিল। ১৯২০-১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্য করার কথা উঠে। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যগীত অভিনয় প্রভৃতির কথা তুলিয়া অনেক ব্রাহ্ম ইহাতে আপত্তি করেন। কিন্তু প্রবীণ হইলেও রামানন্দবাবু আগাগোড়া তরুণদের দলে যোগ দিয়া রবীন্দ্রনাথের সপক্ষে লড়িয়াছেন। *

রবীন্দ্রনাথের কাছে মাঝে মাঝে সব মজার মজার চিঠি নানা স্থান হইতে আসিত। কবি তাহা রামানন্দবাবুকে দেখাইলে দুইজন বৃদ্ধ বসিয়া রীতিমত তাহার রস সম্ভোগ করিতেন। রবীন্দ্রনাথ একদিন নাতবৌ কমলা দেবীর সঙ্গে রসিকতা করিতেছেন এমন সময় রামানন্দবাবু বলিলেন, ‘‘আপনি এঁদের নিয়ে কেন চিরকুমার সভা অভিনয় করুন না? চিরকুমার সভা বইটা ইংরাজিতে অনুবাদ করিলে কেমন হয়? বইটার মধ্যে অপূর্ব সব রসিকতা আছে।’’

কবি বলিলেন, ‘‘ওদের দেশে শালী ও নাতনীদের লইয়া এইরূপ সরস সম্বন্ধ যে নেই।’’

তখনকার দিনে আশ্রমে দিনেন্দ্রনাথের পিতা ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাস করিতেন। দ্বিপুবাবু খুব মজলিশী মানুষ ছিলেন। রামানন্দবাবু নেপালবাবু এই দুইজনে মিলিয়া দ্বিপুবাবুর দরবার সরগরম করিয়া তুলিতেন। আমিও মাঝে মাঝে তাহাতে যোগ দিতাম।

মুলু ছেলেটির পিতার এই সরসতা পাইয়াছিল। সুকুমার রায় মহাশয়ের সহিত মুলু এখানে অনেকবার সুকুমারবাবুর অদ্ভুত রামায়ণ গান করিয়াছে। আবার মুলুর হৃদয় চারিদিকের দুঃখী দুর্গতদের দুঃখেও সদাই ব্যথিত হইত। এমন সহৃদয় বালক বড় একটা দেখা যায় না। নিকটবর্তী গ্রামের দরিদ্রেরা ছিল তার পরমবন্ধু। তাহাদের জন্য সে একটি নৈশ বিদ্যালয় করিল। ইহার

* তিনি প্রবাসীতেও রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্য করা বিষয়ে লিখিয়াছিলেন।

সারাদিন বক্ বক্ করিত। তারা মা ধৈর্য্যচ্যুত হইতেন, আমিই ছিলাম তাহার একজন একনিষ্ঠ শ্রোতা। আমার চিরদিনই নানাদেশের কথা নানাজাতির সুখ-দুঃখ জানিতে কৌতূহল আছে। তাই অধিক দেশভ্রমণ না করিলেও আমি চিরদিনই দেশভ্রমণের গ্রন্থ পড়িতে ভালবাসি। আমার 'বসুন্ধরা' (সোনার তরী) প্রভৃতি কবিতায় তাহা বুঝা যায়। 'দুরন্ত আশা' (মানসী)-তে আমি বেদুইনের হিংসা করিয়াছি। কাবুলীওয়ালা আমার মনের মধ্যেকার সেই বেদুইনের প্রত্যক্ষ বিগ্রহ। কাবুলীওয়ালার মধ্যে আমি আমার সেই ইচ্ছাকেই প্রত্যক্ষ রূপ দিয়াছি।"

কবির লাইব্রেরিতে Sven Hedin, Hudson প্রভৃতির চমৎকার সব ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ছিল। তিনি বহু ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়িয়াছেন। শেষ জীবনে দেশভ্রমণও তিনি কম করেন নাই। গল্পের মূলগুলির কথা বলিতে গিয়া তিনি বলেন, "জীবিত ও মৃত" গল্পের প্লটটা মনে আসে একবার মধ্যরাত্রিতে। ঘুম ভাঙিল, আমি বেড়াইতেছি, মনে হইল আমি যেন এ বাড়ীর কেউ ছিলাম, এখন আর আমি যেন নাই। আমাকে দেখিলে হয়ত এখন সবাই চমকিয়া উঠিবে।"

রামানন্দবাবুকে একদিন কবি বলিলেন, "দেখুন আমেদাবাদে যে বাড়ীতে মেজদাদা ছিলেন তারই ছ'তের একটা চিলেকোঠাতে আমি থাকিতাম। বাড়ীটা প্রাচীন বাদশাহদের। তার প্রত্যেক পাথরের মধ্যে ক্ষুধিত সব পাষাণ আছে তাই আমার মনে হইত। ক্ষুধিত পাষাণের তাহাই মূল।"

১৯২০ সালে সেই বাড়ী ও সেই চিলেকোঠাটা কবিগুরু আমাকে ও সন্তোষ মজুমদার মহাশয়কে লইয়া দেখাইয়াছিলেন। আমরা সেবার তাঁহার সঙ্গে গুজরাট সাহিত্য পরিষদের উৎসবে আমেদাবাদ গিয়াছিলাম।

এমন ভাবেই এক-এক দিন রামানন্দবাবু এক-এক করিয়া তাঁহার পুরাতন সব গল্পের জন্মকথা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং কবি তাঁহাকে একে একে সেই সব কাহিনী শুনাইতেন। এইসব মজলিশ প্রায়ই সন্ধ্যার সময় বসিত। এমন ভাবে "সমাপ্তি", "পোষ্টমাষ্টার", "দুরাশা" প্রভৃতি অনেক গল্পের জন্মকথা তিনি বলিয়াছেন।

স্বল্পভাষী রামানন্দবাবু দেখিতে গম্ভীর হইলেও রীতিমত রসজ্ঞ ছিলেন। নিজেদের মজলিশে তিনি বেশ জমাইয়া গল্প করিতেন। জীবনের শেষভাগে দেখিয়াছি তিনি আমার বাড়ীতে আসিয়া আমার মেয়েদের ও নাতনীদের

তাহা তো ফেরত চাওয়াও যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাহা কিছুতেই চাহিলেন না। কিন্তু কি করিয়া রামানন্দবাবু তাহা টের পাইলেন এবং নিজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কবিগুরুর কাছে প্রাপ্ত রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর সমস্ত স্বত্ব ও মালিকানা তিনি সানন্দে বিশ্বভারতীকে প্রত্যর্পণ করেন।

এই বিষয়ে রামানন্দবাবুর বন্ধু চিন্তামণি ঘোষ মহাশয়ও কম নহেন। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের দুঃখের দিনে অর্থাভাবে কবি তাঁহার সব বাংলা গ্রন্থের স্বত্ব (যাহা তখন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল) এলাহাবাদ ইন্ডিয়ান প্রেসের মালিক চিন্তামণিবাবুকে নাম-মাত্র মূল্যে বিক্রয় করেন। বিশ্বভারতীর আরম্ভ সময়ে দেখা গেল কবির বাংলা গ্রন্থই একটা বিরাট সম্পত্তি। এই স্বত্বটা ফিরিয়া না পাইলে বিশ্বভারতীর কিছুতেই চলে না, ইহা জানিয়াও কবি তাহা ফেরত চাহিতে অসম্মত হইলেন।

কবিকে না জানাইয়া একদিন স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দুইজনে এলাহাবাদে গেলেন এবং চিন্তামণিবাবুর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। চিন্তামণিবাবু তখন কোথায় যাইতেছেন, তাঁহার দুয়ারে গাড়ী প্রস্তুত। কি করিয়া কথাটা চিন্তামণিবাবুর কাছে ঠিকমত পাড়া যায় এই কথাই যখন সুরেন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথ উভয়ে ভাবিতেছেন তখন চিন্তামণিবাবু কথাটা বুঝিয়া বিনা ভূমিকায় বলিলেন, ''আপনারা কেন ইতস্ততঃ করিতেছেন? আপনারা নিশ্চিন্তমনে ফিরিয়া যাউন। আমি বিশেষ প্রয়োজনে এখনই অন্যত্র চলিয়াছি। ফিরিয়া আসিয়াই কাগজপত্র সমেত সব অধিকার নিঃশেষে আপনাদিগকে ফিরাইয়া দিব।"

এমন নিশ্চিত কথার উপর আর তো কথা চলে না। উভয়ে ফিরিয়া আসিলেন। দেখা গেল চিন্তামণিবাবু ফিরিয়া আসিয়াই তাঁহার সব স্বত্ব একেবারে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বভারতীর জন্য ফিরাইয়া দিয়াছেন। আজ বিশ্বভারতীর তাহাই প্রধান সম্পত্তি।

রামানন্দবাবু ও চিন্তামণিবাবু উভয়েই উভয়ের উপযুক্ত বন্ধু ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের বড় ভাই ঋষিতুল্য দ্বিজেন্দ্রনাথের কথা এতক্ষণ কিছুই বলা হয় নাই। তিনি ছিলেন জ্ঞান-তপস্বী সংসার-ভোলা লোক। রামানন্দবাবুকে তিনি অতিশয় স্নেহ করিতেন। রামানন্দবাবুও তাঁহাকে খুবই শ্রদ্ধা করিতেন।

তাঁহার সব লেখাই তিনি রামানন্দবাবুকে পাঠাইতে পারিলে নিশ্চিন্ত হইতেন। এক এক সময় রাত্রিকালে আসিয়াও তিনি আমাকে শুনাইতেন রামানন্দবাবুকে তিনি কি লিখিয়াছেন অথবা রামানন্দবাবু তাঁহাকে কি লিখিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ই বাংলাতে Short hand বা রেখাক্ষরলেখনরীতি প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার সেই প্রণালীই একটু পরিবর্ত্তিত আকারে এখনও চলে। তিনি তেমন বৈষয়িক লোক নহেন বলিয়া সেই প্রণালীর যে তিনিই আদি প্রবর্ত্তক সে কথা অনেকেই এখন জানেন না।

এই রেখাক্ষর বিষয়ে নানা চিত্রসহ তাঁহার সুন্দর হস্তাক্ষরে নানা চমৎকার সরস কবিতার উদাহরণ সমেত দ্বিজেন্দ্রবাবু সাজাইয়া লিখিতেন। তাহা ছাপাইতে গিয়া কোনো মুদ্রাযন্ত্রেই তাহা ঠিক তেমনটি করিয়া মুদ্রিত করিতে পারা গেল না। তখন তিনি রামানন্দবাবুকে ধরিলেন। রামানন্দবাবু বলিলেন, "যদি ছাপানই না যায় তবে আপনার স্বহস্তে লেখা পাতাগুলি হাফটোন করিয়া বই ছাপান যায়।" তাহাতে দ্বিজেন্দ্রবাবু অতিশয় প্রীত হন এবং রামানন্দবাবু সেই ভাবেই মুদ্রণের ব্যবস্থা করিয়া দেন। *

দ্বিজেন্দ্রবাবু শুনিয়াছিলেন রামানন্দবাবু অন্ধদের জন্যও এইরূপ লিখন-প্রণালী বাহির করিয়াছিলেন। তাহা কোনো সাধারণ প্রেসে ছাপিবার মত ছিল না। সেই জন্যই রামানন্দবাবু হয়ত দ্বিজেন্দ্রবাবুর মনের উৎসাহটার অর্থ বুঝিয়াছিলেন ও তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাই দ্বিজেন্দ্রনাথ একদিন রামানন্দবাবুকে একটি কাগজে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আপনার প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউতে এই দেশের অব্যক্ত বেদনাকে প্রকাশ দেবার জন্য আপনি চাকুরী প্রভৃতি সব ছাড়িয়াছিলেন। আপনার সেই চেষ্টা এত দিনে ধন্য হইয়াছে। আপনি আপনার জীবনের প্রারম্ভে অন্ধদের দৃষ্টিহীনতার

---

* দ্বিজেন্দ্রবাবুকে রামানন্দবাবু এত ভালবাসিতেন এবং ভক্তি করিতেন যে দ্বিজেন্দ্রবাবু একবার তাঁহার লেখায় (রেখাক্ষর বিষয়ে) সামান্য একটু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন বোধ করাতে রামানন্দবাবু দ্বিজেন্দ্রবাবুকে খুসী করিবার জন্য প্রবাসীর একটি ছাপা ফর্ম্মা নষ্ট করিয়া নূতন করিয়া আর একটি ফর্ম্মা ছাপিয়া দেন।

দুঃখ দূর করিতে তাহাদের জন্য অক্ষর রচনা করিয়াছিলেন, আপনি ধন্য। অন্ধকে দৃষ্টি দিয়া বোবার মর্মকথা প্রকাশ করিয়া আপনি জীবনকে সার্থক করিয়াছেন। ভগবান আপনার সহায় হউন। বহুকাল আপনি ছিলেন গঙ্গাযমুনাসঙ্গমতীর্থ প্রয়াগধামে। আপনার মধ্যে এখনও জ্ঞান ও সেবার ধারা সমভাবে প্রবহমান। আপনি এখনও জ্ঞান ও সেবার সঙ্গমক্ষেত্র সেই মুক্তিতীর্থবাসী।"

"আপনি অক্ষয় বটের তলে সাধনা করিয়াছেন। আপনার সাধনা অক্ষয় হউক। দ্রৌপদীর স্থালী ছিল অক্ষয় স্থালী। যতক্ষণ দ্রৌপদী নিজে না খাইতেন ততক্ষণ তাঁহার স্থালীর অন্ন ফুরাইত না। স্বার্থের স্পর্শ না ঘটিলে ভগবানের দান অক্ষয় হয়। আপনি নিঃস্বার্থ সাধক, আপনার সাধনা অক্ষয় হইবে। সেই সাধনার অক্ষয় বটমূলে আপনি চিরকাল সমাসীন থাকুন।"

রামানন্দবাবুর জীবনাবসানে দ্বিজেন্দ্রনাথের সেই মহাবাণী স্মরণ করি।

উৎস : *প্রবাসী*, মাঘ, ১৩৫০, পৃ. ৩৪৮-৩৫৬।

লেখক ও কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সুবিদিত সম্পর্ক দীর্ঘতমও বটে, প্রায় সাড়ে চার দশকের। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রামানন্দের বিভিন্ন সময়ের যে সমস্ত রচনা ; তা সাময়িকীর জীর্ণ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধার করে এই প্রথম সুগ্রন্থিত করা হল তরুণ গবেষক অর্ণব নাগের সম্পাদনায়। সম্পাদক-কেশরীর জন্ম-সার্ধশতবর্ষে। সেইসঙ্গে রবীন্দ্র-রামানন্দ সম্পর্কের প্রত্যক্ষদর্শী ক্ষিতিমোহন সেনের একটি অনবদ্য স্মৃতিকথন পরিশিষ্ট হিসেবে যুক্ত হল দুই পরমসুহৃদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের নিবিড় খতিয়ানস্বরূপ।